ত্রৈমাসিক
আমিষ বার্তা
২য় বর্ষ
১ম সংখ্যা
কার্তিক-পৌষ ১৪৩২
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
উম্মে হাবিবা
উপপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. মনিরুজ্জামান তরফদার
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
ও
মাহবুবা খানম
তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)

সার্বিক সহযোগিতায়
মো. সামছুল আলম
গণযোগাযোগ কর্মকর্তা
ও
ইয়াসমিন আক্তার
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
নুসরাত মমতাহিনা
চিত্রশিল্পী

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও সম্পাদনা শাখা
০২-৫৫০১২৮০৫-৭

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

ই-মেইল:
headquarter@flid.gov.bd
iol@flid.gov.bd
iof@flid.gov.bd

ওয়েবসাইট
www.flid.gov.bd

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি হলেও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এই খাত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশে প্রাণিজ আমিষের অন্যতম যোগানদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রাণিসম্পদ খাত পুষ্টি নিরাপত্তা, মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতিগঠন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখছে । জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮১ শতাংশ, জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৯ শতাংশ, কৃষিজ জিডিপিতে ১৬.৫৪ শতাংশ এবং অর্থমূল্যে প্রাণিসম্পদ জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ৯১ হাজার ৩৬ কোটি টাকা । গবেষণার মাধ্যমে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন এবং লাগসই সেবা সম্প্রসারণ, এআই ও আইওটি এর মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। বর্তমানে দেশে প্রায় ২৫১.৭১ লাখ গরু, ১৫.৩২ লাখ মহিষ, ৩৯.৮১ লাখ ভেড়া, ২৭২.৯১ লাখ ছাগল এবং ৪,০৬৬.৫২ লাখ হাঁস-মুরগি পালিত হচ্ছে (সূত্রঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর)। শুধু গবাদিপশু বা হাঁস-মুরগির সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, পরিবর্তন এসেছে প্রাণিজ পণ্য উৎপাদনেও। বর্তমানে অসংখ্য ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড় উদ্যোক্তার বিনিয়োগ, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং প্রাণিসম্পদের বহুমাত্রিক আধুনিক সেবা সম্প্রসারণের ফলে ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে উৎপাদিত হয়েছে ১ কোটি ৫৫ লাখ মে. টন দুধ, ৮৯ দশমিক ৫৪ লাখ মে. টন মাংস এবং ২ হাজার ৪৪০ কোটি ডিম (সূত্রঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর)। প্রাণিজপণ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় দেশ আজ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, দুধ উৎপাদনেও এসেছে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। আশা করা যায়, অতি অল্প সময়েই দেশ দুধ উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। প্রাণিসম্পদ খাতে এই অসাধারণ উৎপাদনশীলতা ও নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির পাশাপাশি এ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে ২০২৫ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী ১ম বারের মতো জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালন করা হয় এবং ৫ ক্যাটাগরিতে ১৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পদক প্রদান করা হয়। অন্যদিকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নদী, সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কাপ্তাই লেককে মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা ও গবেষণার মাধ্যমে সাগরে নতুন নতুন প্রজাতির মৎস্য আবিষ্কার এবং মৎস্য আহরণে বৈদেশিক প্রযুক্তি গ্রহণ করার মতো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সরকার। এ সংখ্যায় প্রকাশিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সকল জনহিতকর ইতিবাচক সংবাদ দেশের আপামর জনতার উপকারে আসবে। আশাকরি এবারের আমিষ বার্তায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদখাতের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়বে। এর ফলে এ খাত সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
০১.	প্রাণিসম্পদ খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার	৩-৪
০২.	ক্যাডেটরা হতে চলছে গভীর সমুদ্রের অকুতোভয় কান্ডারী: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	০৪
০৩.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি	৫-৭
০৪.	গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সহায়তার আশ্বাস এফএও	০৭
০৫.	দেশে প্রথমবার ব্রুসেলা জীবাণুর ভ্যাকসিন উদ্ভাবন	৭-৮
০৬.	টিকায় বদলাবে মাছ চাষের হিসাব	৮-৯
০৭.	খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কাজ করছে সরকার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	০৯
০৮.	তেলাপিয়া : সাশ্রয়ী মূল্যের ‘জলজ মুরগি, বাংলাদেশের পুকুরে সাফল্যের তরঙ্গ	১০
০৯.	দুই তরুণের সুখের খামার : বদলে যাচ্ছে একটি গ্রাম	১১
১০.	আধুনিক দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে সফল খুলনা জেলার খালিশপুরের উদ্যোক্তারা	১১-১২
১১.	দেশীয় গরুর জাত সংরক্ষণের আহ্বান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টার	১২
১২.	জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান আরও বাড়াতে করণীয়	১২-১৩
১৩.	দেশে মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয় কুমিল্লা, বেশি হয় পাঙাশ, তেলাপিয়া	১৪
১৪.	দেশীয় জাত ও আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অগ্রযাত্রা	১৫
১৫.	সাগরে নতুন ৬৫ প্রজাতির মাছের সন্ধান	১৬
১৬.	দেশের পুষ্টি ও অর্থনীতিতে গ্রামীণ নারীদের অবদান অপরিসীম	১৬-১৭
১৭.	মাছের নিরাপদ প্রজনন ও ডলফিন সংরক্ষণে হালদা নদীকে ‘মৎস্য হেরিটেজ’ ঘোষণা	১৭
১৮.	স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামে ডিম যুক্ত করতে হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	১৮
১৯.	মাছের চিপস বানিয়ে মাসে লাখ টাকা মুনাফা নাজমা আক্তারের	১৮-১৯
২০.	মহিষ দেশের সম্পদ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	১৯
২১.	দৃষ্টিজয়ী ফাহিম ফেরদৌসের জীবনের গল্প	১৯-২০
২২.	ইলিশ রক্ষায় জাটকা শিকারে ৮ মাস মেয়াদি নিষেধাজ্ঞা কার্যকর	২০
২৩.	দৈনিক দুইশ লিটার দুধ ও কোরবানিতে দেড় কোটি টাকার গরু বিক্রি	২১
২৪.	চিংড়ি খাতের বিদ্যুৎ বিলে ২০% ছাড় দেওয়া হবে	২১-২২
২৫.	ইসমাইলের মুরগির খামারে শতাধিক মানুষের কর্মসংস্থান	২২
২৬.	চিংড়ি ঘেরে নতুন স্বপ্ন, মাছ চাষে স্বাবলম্বী হচ্ছেন ডুমুরিয়ার নারীরা	২২-২৩
২৭.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫-এর মেলায় তথ্য দপ্তরের পুরস্কার গ্রহণ	২৩-২৪
২৮.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ এ পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ	২৪-২৫
২৮.	৩ হাজার টাকায় শুরু, সাগর এখন ২০ লাখ টাকার রঙিন মাছের মালিক	২৫-২৬
২৯.	মিজানুর রহমানের স্বপ্নের খামার	২৬
৩০.	রাঙ্গামাটির বিএফডিসির প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকীকরণ করা হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	২৭
৩১.	খামারি জাকির হোসেন-এর সফলতার গল্প	২৭-২৮
৩২.	শামীম সিকদারের খামারে এখন ৩ শতাধিক গরু	২৮
৩৩.	মাছেরও রোগ হলে যাবে হাসপাতালে, খুলনায় মৎস্য হাসপাতাল উদ্বোধন	২৯
৩৪.	খামারি বোরহানের বাৎসরিক আয় ৪ লক্ষ টাকা	২৯
৩৫.	শীতকালে মাছের ফুলকা কৃমি রোগ ও ক্ষতরোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিরোধ-প্রতিকার	৩০
৩৬.	কোয়েল পাখির খামারে ভাগ্য বদলেছে জরিনার, মাসে আয় লাখ টাকা	৩০-৩১
৩৭.	শীতকালে মাছের খাদ্য প্রয়োগ কৌশল জেনে নিন	৩১
৩৮.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে প্রশিক্ষণ	৩২
৩৯.	দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি	৩৩-৩৪
৪০.	শীতকালে গবাদিপশুর যত্নে করণীয়	৩৪

প্রাণিসম্পদ খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

দেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, উৎপাদন থেকে বিপণন–সব প্রক্রিয়ায় প্রাণিসম্পদ খাতের নীরব অবদান এখন জাতীয় প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। তবে এই উৎপাদন বজায় রাখা এবং নির্বিঘ্ন রাখতে পারাই বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেন তিনি। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র, জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক শুভেচ্ছা বার্তায় (ভিডিও) তিনি এ কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বল্প পুঁজিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, বাণিজ্যিক খামার ও সহায়ক শিল্প গড়ে তোলা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষ যোগানে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে প্রাণিসম্পদ খাত এখন প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের ফলে দেশে ডিম, দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নাগরিকদের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ করছে। তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রাণিজাত খাদ্যের অপ্রতুলতা, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, প্রাণিজ উপজাত ব্যবহার, মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে পরস্পর সংক্রমণযোগ্য রোগসমূহ দমন, ইমারজিং ও রিইমারজিং রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বর্তমান সময়ে প্রাণিসম্পদ খাতের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অর্ন্তবর্তী-কালীন সরকার এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সপ্তাহব্যাপী এই উদ্যোগ সরকারের প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান করবে। পাশাপাশি, গবাদিপশু পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রান্তিক খামারিদের মাঝে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করবে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, দুধ, ডিম ও মাংসের দাম সামান্য বাড়লে নানান ধরণের কথা শোনা যায়, কিন্তু এসব উৎপাদনে জড়িত মানুষের গল্প খুব কমই সামনে আসে। দুধের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হলে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়, অথচ প্রান্তিক চাষি ও খামারিদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহের মাধ্যমে সেই নির্ভরতা কমানো সম্ভব। খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, বড় খামারিগণ অনেক সময় পশুকে এমন খাদ্য দেন যা শুধু পশুর জন্য নয়, মানবস্বাস্থ্যের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। প্রাণীরা মানুষের ভালোবাসা পায়, নিষ্ঠুরতা নয়–এটিই হওয়া উচিত মূলনীতি। এর আগে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালিত হলেও তা জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হয়নি। দেশে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরে পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, বর্তমানে নিবন্ধিত ৮৫ হাজার ২২৭টি বাণিজ্যিক খামার এবং প্রান্তিক পর্যায়ে প্রায় ১ লাখ ৯১ হাজার পোল্ট্রি খামার রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬ কোটি ৬৮ লাখ ডিম উৎপাদিত হচ্ছে, যেখানে দেশীয় উদ্যোক্তাদের অবদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না। কোন প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করলে তাদের শাস্তির মুখে পড়তে হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, জাতীয় পর্যায়ে এতো বড় পরিসরে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালন এবারই প্রথম হচ্ছে। এর আগে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালিত হয়েছে তবে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করা হয়নি। এ বছর প্রতিপাদ্য রাখা হয়েছে "দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি, প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি"। উপদেষ্টা বলেন, আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীরা তাদের পরিবারের সদস্যের মতোই যত্ন করে পালন করেন। এদের খাদ্যাভ্যাস স্থানীয় পরিবেশের সাথে খাপ খায়, রোগ

বালাই অনেক কম হয়। এর উৎপাদনশীলতা কম হলেও, এদের উৎপাদন খরচও কম। এই জাতগুলো রক্ষা করা জরুরি কারণ এর সাথে গ্রামীণ মানুষের জীবিকাও সরাসরি জড়িত। দেশি জাত সংরক্ষণে গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের এই সময়ে দেশীয় জাতের গবাদিপশুর টিকে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। মিথেন এমিশনের দিক থেকেও এগুলো কম নিঃসরণকারী। দেশীয় জাত রক্ষার বিষয়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কেন্দ্রে গবেষণা হচ্ছে। উপদেষ্টা বলেন, পবিত্র রমজান মাসে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে স্বল্পমূল্যে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ করা হয়। এই কর্মসূচিটি সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ বছর (২০২৫) পবিত্র রমজান মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এবং খামারিদের সহযোগিতায় মোট ৪৯৫টি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিম পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে এ বছর ৯ লাখ ৬৮ হাজার জন ভোক্তার মাঝে মোট ৩১ কোটি ৭৩ লাখ ১২ হাজার টাকার সমমূল্যের প্রাণিজ পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতকে এগিয়ে নিতে আমাদের অগ্রাধিকার–নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, জলবায়ু-সহনশীল খামার ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, এবং এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি। তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের দেশীয় জাত পালনের সুবিধা এবং জলবায়ু সহনশীলতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি ও দেশীয় জাত পালনে খামারিদের প্রণোদনা প্রদানে গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

সূত্র: মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্যাডেটরা হতে চলছে গভীর সমুদ্রের অকুতোভয় কান্ডারী: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি হতে প্রশিক্ষিত হয়ে ক্যাডেটরা হতে চলছে গভীর সমুদ্রের অকুতোভয় কাণ্ডারী। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকালে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ৪৪তম পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, কঠোর অধ্যবসায় এবং প্রগাঢ় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত এই জ্ঞান ক্যাডেটদের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। ক্যাডেটরা একাডেমির সীমিত বলয় ছেড়ে পেশাগত জীবনের বৃহত্তর অঙ্গণে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তাদের কর্ম জীবনে উন্নতির প্রধান ভিত্তি কঠোর পরিশ্রম, সময়ানুবর্তিতা, সততা, কর্মদক্ষতা, মূল্যবোধ এবং দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্য নিষ্ঠা। এই বোধগুলো আত্মস্থ করে ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ক্যাডেটরা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ক্যাডেটদের মধ্যে পদক বিতরণ করেন। বিশেষভাবে, খন্দকার তানভীর ইসলাম (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং) 'বেস্ট অল রাউন্ডার গোল্ড মেডেল' অর্জন করেন। অন্যান্য বিভাগে 'বেস্ট ইন প্রফেশনাল ট্রেনিং সিলভার মেডেল' পায় জাবের শাহরিয়ার (নটিক্যাল সায়েন্স), মাইনুল ইসলাম (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং) ও সাকিবুর রহমান (মেরিন ফিশারিজ) এবং মহিলা ক্যাডেটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে নুসরাত হোসাইন আনিকা (মেরিন ফিশারিজ) পদক অর্জন করেন। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি হতে ৪৪তম ব্যাচের পাসিং আউট প্যারেড-২০২৫ এ ১১০ জন ক্যাডেট পাসড আউট হয়েছেন, যাদের মধ্যে ১৭ জন নারী অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে উপদেষ্টা পাসিং আউট প্যারেডের ৪৪তম ব্যাচের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারী ক্যাডেটদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন। পাসিং আউট প্যারেডে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, তথ্য অধিদপ্তর, মেরিন ডিপার্টমেন্ট, শিপিং অফিস এবং অন্যান্য মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্র: মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

"প্রশিক্ষিত মৎস্য ক্যাডেট গড়ে তুলি, নিরাপদ মাছ নিশ্চিত করি"

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ'র সরকারি স্বীকৃতি: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০১৯ সাল হতে সারাদেশে প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করেছে। জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ'র সরকারি স্বীকৃতির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রতিবছর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় এবং প্রস্তাবের আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে। কিন্তু দীর্ঘ সাত বছর এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা যায়নি। অবশেষে ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে অধিদপ্তর হতে আবারও প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থবিভাগের সম্মতি গ্রহণ করে সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উপদেষ্টা পরিষদের সভায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদ্‌যাপনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে "জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ" উদ্‌যাপনের প্রস্তাব উপস্থাপন করলে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রতিবছর নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে "জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ" উদ্‌যাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। "জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ" উদ্‌যাপনের প্রস্তাব অনুমোদন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি। এ বছর প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ে "প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ" উদ্‌যাপন দেশের প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও আধুনিক, জনসম্পৃক্ত ও প্রযুক্তিনির্ভর খাতে রূপান্তর করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০ টায় শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও ঢাকায় বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে, জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ। জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের এবং পদক বিতরণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। পদক প্রদান : জাতীয় প্রাণিসম্পদ পদক নীতিমালার আলোকে এ বছর প্রাণিসম্পদে বিশেষ অবদানের জন্য ৫টি ক্ষেত্রে মোট ১৫টি পদক প্রদান করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে ১টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য এবং ১টি ব্রোঞ্জ পদক এবং যথাক্রমে ৫০ হাজার, ৩৫ হাজার এবং ২৫ হাজার টাকা দেয়া হয়। পদকের ক্ষেত্রসমূহ :- ১. গবাদিপশুর খামার, ২. পোল্ট্রি খামার, ৩. প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য, ৪. প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, ৫. প্রান্তিক খামারি ও নারী। পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ: গবাদিপশুর খামার : স্বর্ণ পদক-ডাচ ডেইরী লিমিটেড, মো. জিল্লুর রহমান মৃধা, সাতঘড়িয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ; রোপ্য পদক-সুপ্রিম ইকো ব্রিক্স এন্ড এগ্রো লি., মো. আকমল হোসেন, পূর্ব শুলশুলিয়া, টোপেরবাড়ী, ধামরাই, ঢাকা; ব্রোঞ্জ পদক-তন্ময় ডেইরি খামার, মো. আমিরুল ইসলাম, বুড়ারামপুর, লক্ষীকুন্ডা, ঈশ্বরদী, পাবনা। পোল্ট্রি খামার: স্বর্ণ পদক-মেসার্স এসএসবি পোল্ট্রি ও হ্যাচারি কমপেক্স, মো. ইসমাইল হোসেন টুকু, রকিন্দীপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট; রৌপ্য পদক-পদ্মা ফিড এন্ড চিকস লি., মো. আনোয়ারুল হক, বনবিভাগ রোড, হাতিল, জয়পুরহাট; ব্রোঞ্জ পদক-আব্দুর রহিম, মৎস্য ও পোল্ট্রি খামার, মো. আব্দুর রহিম, ঝালুকা, আমগাছী, দুর্গাপুর, রাজশাহী। প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য : স্বর্ণ পদক-দুধওয়ালা ফুড প্রোডাক্টস, মো. মোতাহের হোসেন, ২৫/এ, বিসিক শিল্প নগরী, খাদিমনগর, সিলেট; রোপ্য পদক-বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি., জাহিদুল ইসলাম, ১৩৯-১৪০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা; ব্রোঞ্জ পদক-এশিয়া সুইটমিট, মো. নুরুল বাসার (চন্দন), ডা. ইসাহাক লেন, সূত্রাপুর, বগুড়া। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা : স্বর্ণ পদক-হীড বাংলাদেশ, সুব্রত কাম্পু, কেরামত নগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার; রৌপ্য পদক-ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, মো. শহীদ উজ-জামান, গোবিন্দনগর, সদর, ঠাকুরগাঁও; ব্রোঞ্জ পদক-মমতা ডেইরী ফার্ম ট্রেনিং এন্ড ডেমোনস্ট্রেশন সেন্টার, তৌহিদ আহমেদ, চরকানাই, হাবিলাসদ্বীপ, পটিয়া, চট্টগ্রাম। প্রান্তিক খামারি ও নারী: স্বর্ণ পদক-বেগম পিংকি, প্রয়োজন খামার, আবু বক্করপুর, ৯নং ওয়ার্ড, চরফ্যাশন, ভোলা, রোপ্য পদক-মোছা: পারভীন পিয়ারী, পারভীন দেশী মুরগির খামার, কুসুমশহর, বড়াইল, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট; ব্রোঞ্জ পদক-সাবেরিন নাহার সারা, এফ আর এগ্রো ফার্ম, রঘুরামপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা। সেমিনার আয়োজন: জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে ৪টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রসার, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, খামার ব্যবস্থাপনা এবং জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। এই সেমিনার প্রাণিসম্পদ খাতের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, বাজার সম্প্রসারণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা এবং টেকসই সেবা ব্যবস্থার রূপরেখা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেমিনারে মোট ৪টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। ১. প্রাণিসম্পদ খাতের সমস্যা সম্ভাবনা ও করণীয়; ২. জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান; ৩ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই সেবা সম্প্রসারণ: সম্ভাবনা ও করণীয়; ৪. প্রাণিসম্পদ

সেক্টর উন্নয়নে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ শীর্ষক প্রবন্ধ। সেমিনারের মাধ্যমে খামারি, বিনিয়োগকারী ও বিভিন্ন অংশীজনকে একই প্ল্যাটফর্মে এনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান আরও শক্তিশালী করার সুযোগ সৃষ্টি করে। সেমিনারসমূহে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, মো. শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং অর্থ বিভাগের সচিব ড. মো. খায়রুজ্জামান মজুমদার। সেমিনারসমূহে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. শাকিলা ফারুক, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, মো. শাহজামান খান, পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জনাব সামসুল আরেফিন খালেদ, প্রেসিডেন্ট, ওয়াপসা-বিবি, ডা. মো. শাহীনুর আলম, পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ড. মো. মোস্তফা কামাল, পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। জাতীয় প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ: জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনীতে মোট ১৯৩টি প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শনীকে বর্ণিল করে তোলে। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ :- ১. সরকারি ২০টি; ২.দেশীয় এবং সংকর জাতের গবাদিপশুর ৩৯টি; ৩.সৌখিন পোষা পশু-পাখির ২৪টি; ৪. জেনেটিকস এবং যন্ত্রপাতির ২২টি; ৫. প্রাণিস্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ১৮টি; ৬. প্রাণিজ পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ৪৬টি; ৭. প্রাণিসম্পদ উপকরণ উৎপাদনকারী ২৪টি। প্রদর্শনীতে অন্যান্য আয়োজন ছিল দেশের ঐতিহ্যবাহী ও বাহারি খাবারের আকর্ষণীয় ফুড ফেস্টিভেল, যা মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে আলাদা উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। দর্শনার্থীগণ খেয়েছেন এবং অনেকে খাবার বাসায় নিয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষের অভিব্যক্তি: পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে সাধারণ মানুষ গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। তারা বিভিন্ন খামার প্রযুক্তি, উন্নত জাতের প্রাণী, দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং আধুনিক ভেটেরিনারি সেবার প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থী, নতুন উদ্যোক্তা ও সাধারণ খামারিরা নানা তথ্য জানতে পেরে ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছে। প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা, নানা ধরণের পশু খাদ্য ও এর ব্যবহার পদ্ধতি এবং জেনেটিক উন্নয়নের মডেল দেখে তারা প্রাণিসম্পদ খাতের অভাবনীয় অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে। এর ফলে এ খাত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হয়। এ প্রদর্শনী সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা এবং খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে বড় ভূমিকা রেখেছে। দর্শনার্থীরা দেখেছেন যে প্রাণিসম্পদ খাত কেবল খাদ্য উৎপাদনেই নয়, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তারা মনে করেছেন এ ধরনের আয়োজন বিনোদনের সাথে সাথে প্রাণিসম্পদ বিষয়ে আগ্রহ তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেকেই বলেছেন, এমন প্রদর্শনী নিয়মিত হলে তারা আরও বেশি শিখতে পারবে এবং দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে নিজেদের ভূমিকা কেমন হতে পারে তা বুঝতে পারবে। মিডিয়ার ভূমিকা : জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উদ্‌যাপন এবং এই উপলক্ষ্যে সারাদেশে আয়োজন করা প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে। টেলিভিশন, পত্রিকা, অনলাইন নিউজপোর্টাল এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদিতে প্রচারিত হয়েছে অনুষ্ঠানের খবর, বিভিন্ন প্রতিবেদন, সাক্ষাৎকার ও সংবাদচিত্র, যা দেশের মানুষকে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে প্রদর্শনীর তথ্য জানার সুযোগ করে দিয়েছে। মিডিয়ার ধারাবাহিক কাভারেজের ফলে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য, নতুন প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, দুধ, ডিম, মাংস উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলসহ নানা দিক সাধারণ মানুষের কাছে আরও স্পষ্টভাবে পৌঁছে গেছে। এতে প্রদর্শনীর প্রতি মানুষের আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক মনোভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া মিডিয়া প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব, পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, গ্রামীণ অর্থনীতি, নারীর ক্ষমতায়ন, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। প্রদর্শনী থেকে সংগ্রহ করা বাস্তব চিত্র, খামারিদের অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং সফল উদ্যোক্তার গল্প তুলে ধরে এক ধরনের অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মিডিয়ার প্রচার প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে সরকারের উদ্যোগ, নতুন সম্ভাবনা ও বিনিয়োগের সুযোগ সম্পর্কে দেশব্যাপী আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে যা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও নীতিনির্ধারণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভবিষ্যত পরিকল্পনা: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদ্‌যাপনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল-জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহকে আরও বৈচিত্র্যময়, তথ্য সমৃদ্ধ এবং দেশব্যাপী জনসম্পৃক্ততার একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত করা। আগামী বছরগুলোতে প্রযুক্তিনির্ভর প্রদর্শনী, ডিজিটাল লার্নিং কর্নার, যুব উদ্যোক্তা ফোরাম, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বিজ্ঞানভিত্তিক সেশন, জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রাণিসম্পদের উপর প্রভাব নিরূপণ এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ কার্যক্রম সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি জেলা উপজেলা পর্যায়ে প্রদর্শনীর ব্যাপকতা বাড়ানো, খামারিদের জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণ, ভেটেরিনারি সেবা বিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্প আয়োজন এবং নিরাপদ প্রাণিজখাদ্য উৎপাদন বিষয়ে নতুন মডেল প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানকে আরও গবেষণাভিত্তিক এবং উদ্ভাবনমুখী করতে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের সঙ্গে সমন্বয় জোরদার করার পরিকল্পনা আছে। আরও অনেক সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হবে। প্রাণিসম্পদ খাতের চ্যালেঞ্জ, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু ঝুঁকি, খামার ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং

বিনিয়োগ এসব বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক সেমিনার, নীতি সংলাপ ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনা আয়োজন করার পরিকল্পনা আছে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষ, খামারি, নারী উদ্যোক্তা ও তরুণদের সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান আরও শক্তিশালী করাই হবে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদ্‌যাপনে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহায়তা করা হবে। প্রাণিসম্পদ খাতের প্রচার ও জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উদ্‌যাপন প্রচারের জন্য মিডিয়া পার্টনার হিসেবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। **(লেখক: আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।)**

গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সহায়তার আশ্বাস এফএও

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) মহাপরিচালক কু দোংইউ বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ শিল্পের উন্নয়ন ও কৃষিজাত পণ্য–বিশেষ করে ফল রপ্তানি বাড়াতে সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন। সদর দপ্তর, ইতালির রোমে এফএও-কর্তৃক আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরাম এবং সংস্থাটির ৮০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এফএও এর মহাপরিচালক এ আশ্বাস দেন। বৈঠকে বাংলাদেশকে ‘উচ্চ সাফল্য অর্জনকারী দেশ’ হিসেবে উল্লেখ করে এফএওর মহাপরিচালক বলেন, প্রযুক্তিগত সহায়তা, উদ্ভাবন এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিমুখী সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশকে সহায়তা অব্যাহত রাখবে এফএও। এ সময় প্রধান উপদেষ্টা এফএওর দীর্ঘদিনের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনটি নতুন ক্ষেত্রে সহায়তা চান। এগুলো হলো গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণে সক্ষমতা বাড়ানো, ফল রপ্তানি বাড়াতে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উন্নয়ন এবং ফসল সংগ্রহ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা জোরদার করা, যার মধ্যে সাশ্রয়ী ও বহনযে-াগ্য কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনও রয়েছে। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘আমাদের পুরো সমুদ্র রয়েছে; কিন্তু আমরা মাছ ধরি অগভীর পানিতে। কখনোই সামুদ্রিক সম্পদ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারিনি আমরা। বিদেশি ট্রলারগুলো আমাদের জলসীমায় মাছ ধরে। অথচ আমরা পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত নই। জবাবে এফএও মহাপরিচালক পরামর্শ দেন, বাংলাদেশ যেন চীনের বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানিয়ে গভীর সমুদ্রের মাছের মজুদ নিরূপণ ও টেকসই আহরণ কৌশল প্রণয়নে সহায়তা নেয়। কু দোংইউ বলেন, উচ্চমূল্যের নগদ ফল উৎপাদন কৃষি খাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, ১৯৮০-এর দশকে জাপানে ফল রপ্তানির মাধ্যমে চীন কৃষি উন্নয়নে বিশাল সাফল্য অর্জন করেছিল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ ও পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম। **(সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০২৫)**

দেশে প্রথমবার ব্রুসেলা জীবাণুর ভ্যাকসিন উদ্ভাবন

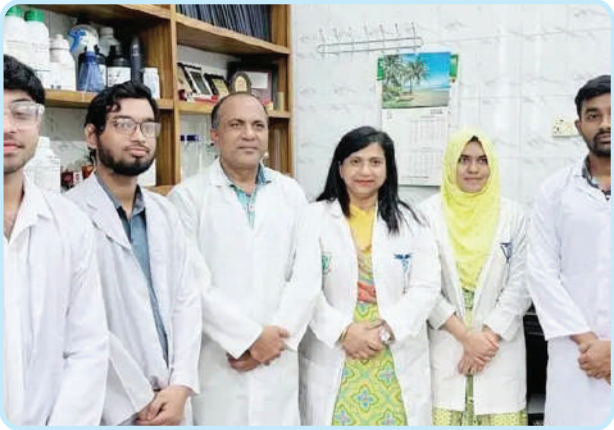

দেশে গবাদিপশুর অন্যতম পরিচিত রোগ হলো ব্রুসেলোসিস। ব্রুসেলা অ্যাবর্টাস (Brucella abortus) নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এ রোগ হয়। এই জীবাণুতে গবাদিপশু আক্রান্ত হলে গর্ভপাত হয়, দুধ উৎপাদন কমে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। যার ফলে আক্রান্ত প্রাণীর জন্য খামারিদের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এ ছাড়া এই জীবাণুটি জুনোটিক (Zoonotic) হওয়ায় প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ছড়াতে পারে। যার মানবস্বাস্থ্যের ঝুঁকিও রয়েছে। তাই আক্রান্ত পশুকে জবাই করে মাটিতে পুঁতে ফেলা বা পুড়িয়ে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্ব প্রাণী স্বাস্থ্য সংস্থা। তবে আশার কথা হলো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) একদল গবেষক দেশে প্রথমবারের মতো ব্রুসেলা অ্যাবর্টাস বায়োভার-৩ জীবাণুটি পৃথকীকরণ এবং এর জেনেটিক বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি ভবিষ্যতে এ রোগ নিয়ে আরও উচ্চতর গবেষণা ও দ্রুত শনাক্তকরণে বড় ভূমিকা রাখবে বলে দাবি গবেষকদের। শুধু জীবাণু পৃথকীকরণেই থেমে থাকেননি বাকৃবি গবেষক দল। তারা প্রথমবারের মতো ইনঅ্যাকটিভেটেড (নিষ্ক্রিয় জীবাণু) ব্রুসেলা ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছেন। এই ভ্যাকসিনটি গবাদিপশুর প্রজনন সক্ষম সময় একবার প্রয়োগ করলে ৬ মাস পর্যন্ত সুরক্ষা দিতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত এই ভ্যাকসিন প্রয়োগে প্রতি পশুতে সর্বোচ্চ ৫০ টাকা খরচ হবে। তবে সরকারি তত্ত্বাবধানে

ব্যাপক উৎপাদন শুরু হলে তখন এটি খামারিরা নামমাত্র দামে পাবেন বলে দাবি গবেষকদের। এই গবেষণার প্রধান ছিলেন বাকৃবির ভেটেরিনারি অনুষদের মাইক্রোবায়োলজি এ্যান্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আরিফুল ইসলাম। সহকারী গবেষক হিসেবে ছিলেন গণ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও পিএইচডি শিক্ষার্থী মো. জামিনুর রহমান এবং বাকৃবির মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোছা. মিনারা খাতুন। ২০১৬ সাল থেকে অধ্যাপক ড. আরিফুল ইসলাম ব্রুসেলা জীবাণু নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। দীর্ঘ গবেষণার পর ২০১৮ সালে দেশে বিদ্যমান ব্রুসেলা অ্যাবর্টাস বায়োবার-৩ এর উপস্থিতি প্রথমবার শনাক্ত করেন। পরবর্তী তিনি জীবাণুটি মলিকুলার পদ্ধতিতে শনাক্তকরণ এবং এর জিনগত বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করেন। এ কাজে ইতালি ও যুক্তরাজ্যের গবেষকরাও সহযোগিতা করেছেন। যা একটি কার্যকর এবং একটি নিষ্ক্রিয় ভ্যাকসিন তৈরির পথ আরও সহজ করেছে। বাংলাদেশ একাডেমি অফ সাইন্সেস-ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (বিএএস-ইউএসডিএ)-এর অর্থায়নে গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে। জানা গেছে, এই ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে সাদা ইঁদুর এবং গাভীর উপর প্রয়োগ করা হয়। ইঁদুরগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ব্রুসেলা ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা প্রাণীগুলোকে নিয়মিত ব্রুসেলা জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত করা হলেও কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি। অন্যদিকে ল্যাবের যেসব ইঁদুরে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়নি তাদের ক্ষেত্রে ব্রুসেলোসিসের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ ছাড়া মাঠে এই রোগটির কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও টাঙ্গাইলের ৪০০ গাভীর দেহে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে এসব গাভীর রক্তের এন্টিবডি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ব্রুসেলোসিস রোগটি প্রতিরোধের জন্য যে মাত্রায় দেহে এন্টিবডি প্রয়োজন তার চেয়ে অধিক মাত্রায় তৈরি হয়েছে। ভ্যাকসিনের চাহিদা সম্পর্কে জানতে চাইলে অধ্যাপক আরিফুল ইসলাম বলেন, 'বর্তমানে দেশে ব্রুসেলোসিসের কোনো ভ্যাকসিন নেই। ভারতে ভ্যাকসিন পাওয়া গেলেও সেটি লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড (দুর্বল জীবাণু)। যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পশুতে গর্ভপাত ঘটাতে পারে এবং দুর্ঘটনাবশত মানুষের দেহে প্রবেশ করলে মানবদেহেও সংক্রমণ ঘটাতে পারে। এ ছাড়া এটি সর্বদা ঠান্ডা (4°C) অবস্থায় রাখতে হয়, নইলে কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বাকৃবির উদ্ভাবিত নিষ্ক্রিয় অণুজীব ভ্যাকসিনে সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। এ ছাড়া এটি প্রয়োগের ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। তা ছাড়া দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এই ভ্যাকসিন বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কার্যকর হবে।' অধ্যাপক আরিফুল ইসলাম আরও বলেন, 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি ও জুনোটিক ঝুঁকি প্রতিরোধের এই তিন দিক বিবেচনা করেই এই জীবাণুর ওপর গবেষণা ও ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করা হয়েছে। অনেকেই অজ্ঞাতবশত আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে এসে সংক্রমিত হন। ফলে আনডুল্যান্ট ফিভার, যকৃত ও পুরুষের প্রজনন অঙ্গে প্রদাহ এবং নারীর ক্ষেত্রে গর্ভপাত পর্যন্ত ঘটতে পারে। তবে নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত খামারের গাভীকে ভ্যাকসিন প্রদান এবং যথাযথ বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিত করলে সহজেই এ রোগ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। **(সূত্র: দৈনিক ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১২ অক্টোবর ২০২৫)**

টিকায় বদলাবে মাছ চাষের হিসাব

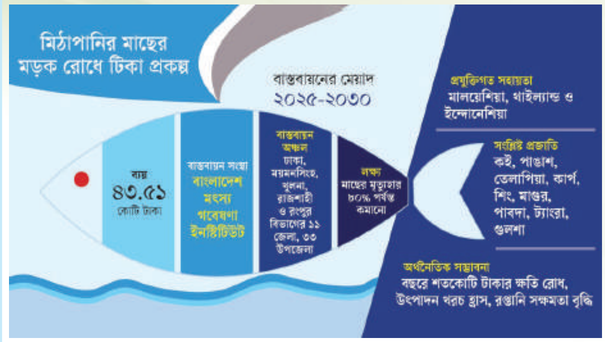

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগে প্রতিবছর মাছ চাষ খাত হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এবার সেই ক্ষতি ঠেকাতে সরকার নিচ্ছে ৪৩ কোটি টাকার টিকা প্রকল্প। দেশীয় প্রজাতির মাছকে রোগমুক্ত রাখতে প্রথমবারের মতো তৈরি হবে মিঠাপানির মাছের টিকা, যা মৃত্যুহার কমাবে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রকল্পের সফল প্রয়োগ হলে মাছ চাষ খাত নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াবে, বাড়বে উৎপাদন, বিনিয়োগ আর রপ্তানির সুযোগ। দেশের মিঠাপানির খামারগুলোয় প্রতিবছর অজানা ও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে বিপুল পরিমাণ মাছ মারা যায়। এই ক্ষতি থেকে চাষিদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় শতকোটি টাকায়। এতে অনেক উদ্যোক্তা বাধ্য হয়ে খামার বন্ধ করে দিচ্ছেন। সেই হতাশার পরিপ্রেক্ষিতেই শুরু হচ্ছে 'মিঠাপানির মাছের মড়ক প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন' প্রকল্প; যা দেশের মাছ চাষে এক নতুন যুগের সূচনা করতে পারে। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে। পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১১ জেলার ৩৩ উপজেলায়। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের বলেন, দেশীয় প্রজাতির টেকসই উৎপাদন ধরে রাখতে এই প্রকল্প অপরিহার্য। এটি সফল হলে শুধু উৎপাদন বাড়বে না, বরং মাছ চাষে আত্মনির্ভরতা আরও সুদৃঢ় হবে। সরকারি তথ্যমতে, বর্তমানে দেশের মোট মাছ উৎপাদনের ৫৭ শতাংশ আসে মিঠাপানির খামার থেকে। প্রথম ধাপে ৯টি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি–কই, পাঙাশ, তেলাপিয়া, কার্প, শিং, মাগুর, পাবদা, ট্যাংরা ও গুলশায় এই টিকা প্রয়োগ করা হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ প্রকল্পে সহযোগিতা দেবে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মুখে খাওয়ার এই টিকা সফলভাবে প্রয়োগ করা গেলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় টেকসই মাছ চাষে নেতৃত্ব নিতে পারে। এতে একদিকে খামারিদের আর্থিক ঝুঁকি কমবে, অন্যদিকে মাছ চাষ খাত পাবে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতি ও বিনিয়োগের নতুন গতি। মৎস্য বিশেষজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. সিরাজুম মুনির বলেন,

চাষিরা বিক্রির ঠিক আগমুহূর্তে অনেক সময় ৭০-৮০ শতাংশ মাছ হারান। কার্যকর টিকা প্রয়োগ করা গেলে এই মৃত্যুহার নাটকীয়ভাবে কমবে। প্রকল্পের আওতায় আধুনিক বায়োমলিকুলার প্রযুক্তিতে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস শনাক্ত করা, জীবাণুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং তাদের বিরুদ্ধে লক্ষ্য ভিত্তিক টিকা তৈরি করা হবে। মুখে খাওয়ার টিকা উদ্ভাবনকে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার; কারণ, এটি প্রয়োগে সহজ, খরচে সাশ্রয়ী এবং মাছের ওপর কোনো শারীরিক চাপ ফেলে না। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি ও একাডেমিক খাতেও চলছে গবেষণা। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করেছে 'বায়োফ্লিম' নামে একটি টিকা, যা এরোমোনাস হাইড্রোফিলা ব্যাকটেরিয়াজনিত ক্ষত, আলসার ও পাখনা পঁচা রোগ প্রতিরোধে ৮৪ শতাংশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি ও পানিসম্পদ বিভাগের সদস্য (সচিব) ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, টিকা উদ্ভাবন সফল হলে এই খাত বিদেশি বিনিয়োগের নতুন দ্বার খুলে দেবে। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২০৩০ সালের জুন পর্যন্ত এই প্রকল্প ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হবে। বাজেট কাঠামো অনুসারে প্রতি অর্থবছরে ৭ থেকে ১৬ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। সরকারের প্রত্যাশা, এই প্রকল্প শুধু রোগ প্রতিরোধে নয়, বরং উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। **(সূত্র: আজকের পত্রিকা, ৪ নভেম্বর ২০২৫)**

"নিয়মিত ভ্যাকসিন নিলে সুস্থ-সবল প্রাণী মিলে"

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কাজ করছে সরকার: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, দেশীয় প্রজাতির প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫-এর র‍্যালি শেষে তিনি এসব কথা বলেন। মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে শুরু হয়ে শেরেবাংলা নগর পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে গিয়ে শেষ হয় র‍্যালিটি। এ সময় প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, অনিরাপদ বিদেশি প্রাণিজ সম্পদ আমদানির পক্ষে নয় সরকার। তাই দেশীয় প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদনের মাধ্যমে শুধু দেশের চাহিদাপূরণ নয়, বিদেশেও এর বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে সরকার। পরে প্রাণিসম্পদ খাতের সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়'-শীর্ষক সেমিনার পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, সরকার পোল্ট্রি সেক্টরে আমদানি নির্ভরতা কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি আরও বলেন, পোল্ট্রি শিল্পের জন্য ভুট্টা ও সয়াবিন আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হলে এই দুটি ফসলকে কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। এলডিসি থেকে বের হয়ে যাওয়ার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, ২০২৬ সালে

এলডিসি থেকে গ্রাজুয়েশন হওয়া একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এলডিসি থেকে বের হতে হলে যেসব সক্ষমতা প্রয়োজন, তা এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি। আমরা বের হয়ে গেলে একদিকে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে, তারপরও এ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পোল্ট্রি সেক্টরের ক্ষুদ্র খামারিদের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে উপদেষ্টা বলেন, পোল্ট্রি ফিডের সংকট সমাধান জরুরি। ক্ষুদ্র খামারিদের টিকিয়ে রাখতে হলে ফিড সংক্রান্ত সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধান করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের মাধ্যমে সবচেয়ে যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা এবং এই খাতে নতুন উদ্যোক্তা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা। তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর বহু শিক্ষার্থী পড়াশোনা শেষ করে বের হচ্ছে। আমরা চাই তারা প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে আসুক। এ বিষয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে। তাদের সহযোগিতায় নতুন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে; কিভাবে উদ্যোক্তা হতে হয়। তিনি আরও বলেন, প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, আমরা তা বাস্তব কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। সেমিনার পরিচালনা করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। **(সূত্র: মো: মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

তেলাপিয়াঃ সাশ্রয়ী মূল্যের ‘জলজ মুরগি’,বাংলাদেশের পুকুরে সাফল্যের তরঙ্গ

একটা সময় মাছ মানেই ছিল রুই, কাতলা বা ইলিশ। কিন্তু এখন দেশের গ্রামীণ পুকুর থেকে শুরু করে শহরের হাটবাজার পর্যন্ত এক নতুন তারকার উত্থান–তেলাপিয়া। দ্রুত বৃদ্ধি, সহজ চাষ পদ্ধতি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে তেলাপিয়াকে বিশ্বের অনেক দেশেই বলা হয় ‘জলজ মুরগি’, কেউ বলেন ‘গ্রামের রুপালি সম্পদ’। যে যেভাবেই ডাকুন না কেন, এই মাছ এখন বাংলাদেশের নীল অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তেলাপিয়া চাষ আজ আর কেবল মাছ চাষ নয়–এ যেন গ্রামীণ অর্থনীতির এক নতুন গল্প। একসময়ের অকাজের পুকুর এখন চাষির জন্য হয়ে উঠেছে টাকার ব্যাংক। মাত্র চার থেকে পাঁচ মাসে ফসল তোলা যায়, খরচ কম, ঝুঁকি সামান্য–ফলাফল, বছরে দুই থেকে তিনবার আয়! ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা কিংবা বরিশালের হাজারও পরিবার এখন তেলাপিয়ার চাষের ওপর নির্ভরশীল। এক মাছের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে চাষি, ফিড মিল, হ্যাচারি, বাজার আর রেস্টুরেন্টে–গড়ে তুলেছে হাজারও কর্মসংস্থানের সুযোগ। বিশ্বে তেলাপিয়ার রাজত্ব তেলাপিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় মাছ। তেলাপিয়া এখন শুধু একটি খাবার নয়–এটি বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ অর্থনীতির নতুন প্রতীক। বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (BFRI), মৎস্য অধিদপ্তর এবং সরকারি-বেসরকারি নানাবিধ উদ্যোগে এখন দেশ বিশ্বের শীর্ষ তেলাপিয়া উৎপাদকদের কাতারে। ২০১০-’১১ অর্থবছরে যেখানে উৎপাদন ছিল মাত্র ৯৭,৯০৯ টন, ২০২১-’২২ সালে তা লাফিয়ে বেড়ে দাঁড়ায় ৩.২৯ লক্ষ টনে। ২০২৩-’২৪ সালে দেশের মোট মাছ উৎপাদন ছিল প্রায় ৫০.১৮ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে তেলাপিয়ার উৎপাদন প্রায় ৪ লাখ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তেলাপিয়া উৎপাদনকারী দেশ আর এশিয়ায় আমাদের অবস্থান তৃতীয়। তেলাপিয়ার পুষ্টিগুণ তেলাপিয়ার নরম মাংস, মৃদু স্বাদ এবং উচ্চ প্রোটিন উপাদান একে জনপ্রিয় করে তুলেছে। ভাজা, ঝোল বা গ্রিল–যেভাবেই রান্না করা হোক, এটি খেতে সহজ ও সুস্বাদু। তেলাপিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর উচ্চ প্রোটিন ও নিম্ন চর্বি। প্রতি ১০০ গ্রাম রান্না করা তেলাপিয়াতে থাকে প্রায় (২০-২১) গ্রাম প্রোটিন, যা শরীরের কোষ গঠন ও ক্ষয়পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একই পরিমাণ মাছ থেকে মাত্র ১.৭ থেকে ২ গ্রাম চর্বি পাওয়া যায়, ফলে এটি হৃদরোগীদের জন্যও নিরাপদ। তেলাপিয়াতে রয়েছে ভিটামিন বি১২, নিয়াসিন (বি৩), সেলেনিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস–যেগুলো শরীরের শক্তি উৎপাদন, রক্তকণিকা গঠন, স্নায়ু ও হাড়ের সুস্থতা বজায় রাখতে অপরিহার্য। বিশেষ করে সেলেনিয়াম দেহে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, যা কোষকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তেলাপিয়া মাছের মধ্যে রয়েছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা মস্তিষ্কের বিকাশ, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি এবং হৃদপিণ্ডের সুস্থতায় সাহায্য করে। যদিও তেলাপিয়াতে সামুদ্রিক মাছের তুলনায় ওমেগা ৩ কম, তবু এর পরিমাণ শরীরের জন্য যথেষ্ট উপকারী মাত্রায় রয়েছে। তেলাপিয়া সহজপাচ্য ও স্বাদে মৃদু হওয়ায় এটি শিশু, বৃদ্ধ এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য আদর্শ মাছ। এতে পারদের মাত্রা (Mercury level) অনেক কম থাকায় এটি নিরাপদ খাদ্য হিসেবেও বিবেচিত। দিনে একবার খাবারে তেলাপিয়া রাখলে শরীর পায় প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজের চমৎকার ভারসাম্য। নীল নদ থেকে ময়মনসিংহ-কুমিল্লায় মাছের জগতে তেলাপিয়া আজ এক পরিচিত নাম। কিন্তু এই মাছের গল্প শুরু হয় হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতা প্রাচীন মিশরের নীল নদে। বিংশ শতাব্দিতে মধ্যভাগে তেলাপিয়া পৌঁছায় এশিয়ায়। থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, চীনসহ বিভিন্ন দেশে তেলাপিয়া বাণিজ্যিক চাষে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭০-এর দশকে এটি গবেষণার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আনা হয়। তবে আসল পরিবর্তন আসে ২০০০ সালের পর, যখন ‘জেনেটিক্যালি ইমপ্রুভড ফার্মড তেলাপিয়া’ (GIFT) জাত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। GIFT হচ্ছে জেনেটিকালি উন্নত তেলাপিয়ার জাত, যা দ্রুত বাড়ে, টিকে থাকে, আর দেয় তিনগুণ উৎপাদন। তবে এই সাফল্যের গল্পেও আছে সতর্কতার ছায়া। মানহীন পোনা, পানিদূষণ, বাজারে দামপতন আর জলবায়ুর প্রভাব–সব মিলিয়ে চাষিদের সামনে রয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জ। সময় এসেছে উন্নত ব্যবস্থাপনা, টেকসই চাষ পদ্ধতি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের। আমাদের উচিত উন্নত চাষ প্রকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ,বাজার সংগঠন ও রপ্তানিতে মনোযোগ দিয়ে তেলাপিয়া চাষকে আরও গতিশীল ও টেকসই করা। কারণ এই মাছ শুধুই পুকুরের মাছ নয়–এটি আমাদের ভবিষ্যতের খাদ্য ও জীবিকা পরিকল্পনার এক অংশ। (**লেখক : ড. সেলিনা ইয়াসমিন, উর্ধ্বতন-বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ড. মো. শরীফুল ইসলাম, উর্ধ্বতন-বৈজ্ঞানিক কর্মকতা,বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট**।)

“ অল্প খরচে তেলাপিয়া চাষ চাহিদা মিটবে বারো মাস”

দুই তরুণের সুখের খামার : বদলে যাচ্ছে একটি গ্রাম

বগুড়ার কাহালুর বাঁকাদিঘী পাড়ে সুখের খামারে গরু রাখার ঘরের নাম 'কাউ স্টুডিও'। এ স্টুডিওতে আছে নানা প্রজাতির ছোট গরু। পাশেই খোলা চত্বরে ঘুরে বেরাচ্ছে নানা প্রজাতির ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গারল, ডরপার বা আফ্রিকান প্রজাতির ভেড়া। গরু রাখার ঘরকে সাধারণত গোয়ালঘর বলে। চত্বরের পাশে আরও আছে মুরগি, ছাগল ও গরুর আরও কয়েকটি ঘর এবং মাটিছাড়া ঘাস উৎপাদন কেন্দ্র। খামারটির দুই সহ-প্রতিষ্ঠাতা জোবায়ের ইসলাম এবং তাসদীখ হাবীব। দুই বিঘার এ লাইভ স্টক সেকশনে বর্তমানে ৫০টি গরু, শতাধিক ছাগল-ভেড়া রয়েছে। খামারের আওতায় আরও আছে ১২ বিঘার ধানক্ষেত, দুই বিঘার পুকুর, ১ বিঘার কলার বাগান এবং আধা বিঘায় গড়ে তোলা এগ্রো রিসোর্ট। এসব লালন-পালনে কাজ করছেন ১৯ জন। জোবায়ের বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে সুখের খামারের শুরু ২০২০ সালে। তবে ২০১৬ সাল থেকে অল্প অল্প করে কাজ করি। মূলত খামারি হওয়ার স্বপ্ন অনেক আগে থেকেই। ঢাকার সরকারি তিতুমীর কলেজ থেকে বিবিএ এবং এমবিএ শেষ করে ব্যবসা শুরু করি। জোবায়ের বলেন, ঢাকা থেকে একজন শিক্ষিত তরুণ গ্রামে এসে খামার করছেন, এটা দেখে এলাকার লোকজন একটু অবাক হন। পেছনে পেছনে অনেকে কানাঘুষাও করেন। তবে আমি সেসবে কান দেইনি। এ ছাড়া শুরুতে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হই। বিশেষ করে গরু-ছাগল কেনাবেচা করতে গিয়ে। অনেক সময় লোকসানও হয়েছে, তবু হাল ছাড়িনি। জোবায়ের জানান, সুখের খামারের পাশাপাশি তারা 'সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ' নামে একটি প্রকল্প দাঁড় করাচ্ছেন। ৩০ বিঘা জমির উপর হবে এ প্রকল্প। প্রকল্পে থাকছে সমন্বিত কৃষি খামার, এগ্রো রিসোর্ট, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ফাউন্ডেশন, মসজিদ এবং হাফেজি এতিমখানা মাদ্রাসা। প্রকল্পের কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে, ২০২৭ সালের শেষে কাজ সম্পন্ন হবে। জোবায়ের বলেন, কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষিত ও তরুণ লোকের অভাব। আমরা চাই এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত তরুণরা এগিয়ে আসুক। এতে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি আরো শক্তিশালী হবে। আমাদের মূল লক্ষ্য 'ফার্মিং টু ডাইনিং'। অর্থাৎ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ। অন্যদিকে প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয়দের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এরইমধ্যে এর সুফল স্থানীয় গ্রামবাসী পেতে শুরু করেছেন। **(সূত্র: দৈনিক দেশ রুপান্তর, ৯ ডিসেম্বর ২০২৫)**

আধুনিক দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে সফল খুলনা জেলার খালিশপুরের উদ্যোক্তারা

সত্য রঞ্জন সাহা খুলনা জেলার খালিশপুর এলাকার একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। তার পিতা ১৯৯৭ সালে ছোট আকারে দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে ব্যাবসা শুরু করেন। সত্য রঞ্জন সাহা এই পারিবারিক উদ্যোগকে আধুনিকভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খালিশপুরে প্রথম আউটলেট স্থাপন করেন । ২০১৭ সালে দ্বিতীয় আউটলেট চালু করেন। ২০২১ সালে খুলনা শহরের বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় "সীমান্ত সুইটস" তৃতীয় আউটলেট প্রতিষ্ঠা করেন। ধারাবাহিক পরিশ্রম এবং গ্রাহক আস্থার ফলে প্রতিষ্ঠানটি আজ খুলনা জেলার অন্যতম ক্ষুদ্র দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। ২০২৩ সালে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (LDDP) এর আওতায় সত্য রঞ্জন সাহা, Small Scale Milk Processor হিসেবে চলমান ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ১১ লক্ষাধিক টাকা অনুদান লাভ করেন। অনুদান থেকে তিনি সুইট মেকার মেশিন, ই ইনকিউবেটর, দুগ্ধজাত পণ্যের আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি, অটোমেশন ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা স্থাপন করেন, যা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নিশ্চিত করে। বিক্রয় ও বাজার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। খুলনা জেলার খালিশপুর এলাকায় দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন দীর্ঘদিন ধরে প্রথাগত পদ্ধতি নির্ভর ছিল। স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি ও নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আধুনিকায়ণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ সক্ষমতা উন্নয়ন এবং বাজার সম্প্রসারণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প-এর সহায়তায় সত্য রঞ্জন সাহার মতো মুক্তা ঘোষ ডেইরি এমন একটি উদ্যোগ, যা স্থানীয় কৃষক ও দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের পণ্যের

বাজারজাতকরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপদ দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহে ভূমিকা রাখছে। ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ইমাম উদ্দীন কবীর, মুক্তা ঘোষ ডেইরি পরিদর্শন করেন। সফরসঙ্গী ছিলেন উপসচিব মুহাম্মদ শাহাদত খন্দকার। পরিদর্শনকালে উৎপাদন প্রক্রিয়া, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। নিদের্শনা অনুসারে প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা ও মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে, যা সার্বিক কার্যক্ষমতা ও মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্প সহায়তা ও সরকারি দিকনির্দেশনার ফলে "মুক্তা ঘোষ ডেইরির" উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পণ্যের গুণগত মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, বিক্রয় ও আর্থিক সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয় ফলে নভেম্বর ২০২৫-এ খুলনা জেলায় আয়োজিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-তে প্রতিষ্ঠানটি "দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ" ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করে। মুক্তা ঘোষ ডেইরির এই সাফল্যদার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাবসা সম্প্রসারণে উৎসাহ প্রদান করা হয়, স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপদ ও মানসম্মত দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত হয়, অন্যান্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি হয়। সত্য রঞ্জন সাহা ও মুক্তা ঘোষ এর উদ্যোগ প্রমাণ করে যে, সরকারি প্রকল্প সহায়তা, সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা এবং উদ্যোক্তার নিষ্ঠা একত্রিত হলে ক্ষুদ্র উদ্যোগকে আধুনিক ও টেকসই ব্যবসায় রূপান্তর করা সম্ভব। এ ধরনের উদ্যোগ খুলনা জেলার দুগ্ধ খাতের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং অন্যান্য উদ্যোক্তাদের জন্য প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। **(সূত্র : নিজস্ব প্রতিবেদক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।)**

দেশীয় গরুর জাত সংরক্ষণের আহ্বান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টার

দেশীয় গরুর জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। তিনি বলেন, আমাদের যেসব দেশীয় গরুর জাত আছে, সেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজস্ব পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে আছে। তাই স্থানীয় গরুর জাতগুলোর ভেতরে থাকা অন্যান্য জেনেটিক বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যতের টেকসই প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ। বুধবার (৫ নভেম্বর) ঢাকার রাজধানীর হোটেল সারিনায় Scaling-up Livestock Climate Actions to Enhance Nationally Determined Contributions – Phase II -শীর্ষক জাতীয় স্টেকহোল্ডারদের ভ্যালিডেশন কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা স্থানীয় জলবায়ু সহনশীল দেশীয় জাতের গবাদিপশুর সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, কেবল সংকর জাতের দিকে ঝুঁকলে ভবিষ্যৎ ঝুঁকির আশঙ্কা বাড়তে পারে। তাই দেশীয় জাত সংরক্ষণ করতে হবে। তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদি তাপপ্রবাহ, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা ও উৎপাদন ব্যাহত হওয়া–এ বিষয়গুলো এখন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে উঠে আসছে। তাই কপ-৩১ এ বাংলাদেশি গবেষক, বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বৈশ্বিক আলোচনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কর্মশালায় স্বাগত বক্তৃতা করেন FAO-এর ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ড. খান শহিদুল হক। দুগ্ধ ও গরুর মাংস উৎপাদন ব্যবস্থায় গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস প্রকল্পের অর্জন ও পরবর্তী পথ নির্দেশনা বিষয়ে উপস্থাপনা করেন LDDP প্রকল্পের উপপরিচালক ড. শাকিফ-উল-আজম। **(সূত্র: মো. মামুন হাসান সিনিয়র তথ্য অফিসার (তথ্য ও জনসংযোগ কার্যকর) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।)**

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান আরও বাড়াতে করণীয়

বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রাণিসম্পদ খাত এক অনন্য ভূমিকা পালন করছে। প্রাণিসম্পদ আজ দেশের একটি অন্যতম প্রধান উন্নয়নমুখী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ১৫ লাখ প্রান্তিক খামারি তাদের দৈনিক জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে দুই-তিনটি করে পশু পালন করে থাকেন। পবিত্র ঈদুল আজহা তথা কোরবানিকে কেন্দ্র করে প্রায় আট লাখ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারি গবাদিপশু লালন-পালন করেন। দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগ প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। শুধু পোল্ট্রি খাতেই প্রায় ৬০ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত, যার মধ্যে ৪০ শতাংশই নারী। ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতের জিডিপিতে অবদান ১ দশমিক ৮১ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ১৯ শতাংশ। কৃষিজ জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ। দেশে বর্তমানে প্রায় আড়াই কোটি গরু, ১৫ লাখ মহিষ, তিন কোটি ছাগল-ভেড়া ও ৪০ কোটি হাঁস-মুরগি রয়েছে। এসব গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির মাধ্যমে ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে ১৫৫ লাখ টন দুধ, ৮৯ দশমিক ৫৪ লাখ টন

মাংস ও ২ হাজার ৪৪০ কোটি ডিম উৎপাদন হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রান্তিক খামারিদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, বাচ্চা সরবরাহ, খাদ্য, ভ্যাকসিন ঔষধ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত হিসেবে পোলট্রি শিল্প এরই মধ্যে স্থান দখল করে নিয়েছে। এ খাতে বর্তমানে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামার থেকে বছরে ৩৫ লাখ একদিনের বাচ্চা সরবরাহ করে। দেশে পোলট্রি ও ডেইরি খাতের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক পশুখাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিকাশ লাভ করেছে। দেশে বছরে প্রায় ৭৫ লাখ টন পোলট্রি ও ডেইরি ফিড উৎপাদন হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত ফিড মিলের সংখ্যা ৩৪২টি। মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন-২০১০ ও পশুখাদ্য বিধিমালা-২০১৩ অনুসরণপূর্বক এসব খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্য একটি হলো দেশের ডেইরি খাত। বর্তমানে দেশে প্রায় ২ দশমিক ৫ কোটি গবাদিপশুর মধ্যে ৮৬ লাখ দুগ্ধবতী গাভী রয়েছে, যার মধ্যে ৪৫ লাখ দেশীয় গাভী ও ৪১ লাখ সংকর জাতের গাভী। দুগ্ধ খাতে শতকরা ৮০ ভাগ খামারি প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষক ও নারী, যারা মোট উৎপাদিত দুধের শতকরা ৭০ ভাগ জোগান দিয়ে থাকে। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪ হাজার ২৭৮টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রতি বছর প্রায় ১৭ লাখ উন্নত জাতের বাছুর উৎপাদন হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়নে (যেমন : রেড চিটাগাং ক্যাটেল, মীর কাদিম, পাবনা, নর্থ বেঙ্গল গ্রে ও নেত্রকোনা ব্ল্যাক) পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, সিলেট ও সুনামগঞ্জের হাওরের মহিষের প্রাপ্যতা ও উৎপাদন বেশি হয়ে থাকে। সরকারি তিনটি মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার (বাগেরহাট মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, টাঙ্গাইল মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার এবং সাভার মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার) হতে ভর্তুকি মূল্যে এসব হাওর ও বিভিন্ন অঞ্চলে খামারিদের মাঝে মহিষের বাচ্চা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা নিত্যনতুন চর ও সরকারি খাস জমি খামারিদের মাঝে চারণভূমি হিসেবে ব্যবহারের জন্য সমবায়ভিত্তিক বন্দোবস্ত প্রদান করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে, যাতে এসব অঞ্চলের সাধারণ জনগোষ্ঠী মহিষ পালনে আরও উৎসাহী হয়।

প্রাণিস্বাস্থ্যের উন্নয়নে একটি বাধা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই। এসব রোগ প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর ১৭ রোগের প্রায় ৩৪ কোটি ডোজ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও বিতরণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি উদ্ভূত গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ (এলএসডি) রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে প্রায় ১৭ লাখ টিকা মাঠ পর্যায়ে প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া গবাদিপশুর অন্যতম ক্ষুরা রোগ (এফএমডি) মুক্ত অঞ্চল তৈরির লক্ষ্যে দেশের ৪টি জেলায় (সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ ও ভোলা) টিকাদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে, যা চলমান রয়েছে। সারা দেশ থেকে ছাগলের মারাত্মক সংক্রামক রোগ পিপিআর (পিপিআর) নির্মূলে প্রায় ছয় কোটি ডোজ টিকা সাম্প্রতিক সময়ে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাণী থেকে মানবদেহে ছড়ায় এরকম সংক্রামক জুনোটিক রোগ যেমন: অ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতংক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ পরীক্ষণে ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরগুলোয় মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ১৯৬৪ সালে মিরপুর ঢাকায় প্রায় ১৮৬ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায় ১৩৫টি প্রজাতির ৩ হাজার ৩২৫টি প্রাণী রয়েছে। বছরে প্রায় ৪০-৪৫ লাখ দর্শনার্থী এ চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে। চিড়িয়াখানা থেকে প্রায় ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর কাছে স্বল্পমূল্যে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের লক্ষ্যে ২০২৫ সালে পবিত্র রমজান মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ও খামারিদের সহযোগিতায় ৪৯৫টি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিম পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এ বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে এ বছর ৯ লাখ ৬৮ হাজার ভোক্তার মাঝে মোট ৩১ কোটি ৭৩ লাখ ১২ হাজার টাকার সমমূল্যের প্রাণিজ পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে। বিপুল বিস্তৃত প্রাণিসম্পদ খাতে যেসব উদ্যোক্তা কাজ করছেন তাদের উদ্বুদ্ধ করা, এ খাতে তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা এবং এ খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা। প্রাণিসম্পদ খাতে যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে তা উপস্থাপন করা, আকর্ষণীয় স্থানীয় উন্নত জাতের গবাদিপশু ও পোলট্রির প্রদর্শন করা এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যবাহী ও বাহারি প্রাণিজ খাবারের সঙ্গে সবাইকে পরিচিত করানোর জন্য 'জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ' পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। **(লেখক: আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)**

"বেশি বেশি খামার গড়লে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে"

"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

দেশে মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয় কুমিল্লা, বেশি হয় পাঙাশ, তেলাপিয়া

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার রায়পুর গ্রামটির অবস্থান ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ঘেঁষে। দেশের ব্যস্ততম এই মহাসড়ক দিয়ে চলাচলের সময় যত দূর চোখ যায়, শুধু মাছ চাষের দৃশ্য। ওই গ্রামে এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ হয় না। আরেক উপজেলা চান্দিনা। সেটার প্রত্যন্ত একটি গ্রাম পিহর। সেখানে গ্রামীণ সড়ক দিয়ে চলাচলের সময় চারদিকে চোখে পড়ে শুধু মাছের খামার। জেলার বিভিন্ন গ্রামে গেলে বোঝা যায়, মাছ উৎপাদনে কতটা এগিয়ে গেছেন এখানকার মানুষ। সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে অনেকেই জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার পেয়েছেন। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০২৩-'২৪ সালের হিসাবে, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে মাছ উৎপাদনে কুমিল্লা দ্বিতীয়। এই জেলা থেকে চাহিদার দ্বিগুণের বেশি মাছ উৎপাদিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। শুধু পুকুর আর দিঘির বদ্ধ জলাশয়ই নয়, প্লাবনভূমিতে মাছ চাষে কুমিল্লা দেশের মডেল। যে জমি বর্ষায় ডুবে যায় এবং শুকনা মৌসুমে আবার চাষাবাদ বা অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়, সেটাই প্লাবনভূমি। মাছ উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, প্রাকৃতিকভাবেই কুমিল্লার মাটি ও পানি মাছ চাষের জন্য উপযোগী। চাহিদার দ্বিগুণের বেশি মাছ জেলা মৎস্য কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক অশোক কুমার দাস বলেন, মাছ উৎপাদনে প্রথম অবস্থানে আছে ময়মনসিংহ জেলা। সেখানে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মাছ উৎপাদনে যেকোনো গবেষণা সেখানে আগে প্রয়োগ হয়, এ জন্য ময়মনসিংহ জেলার উৎপাদন কুমিল্লার চেয়ে কিছুটা বেশি। বর্তমানে সেখানে ৩ লাখ ৪৫ হাজার টন মাছ উৎপাদন হয়ে থাকে বছরে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা কুমিল্লায় হচ্ছে ৩ লাখ ১৫ হাজার টন মাছ। মাছ উৎপাদনে দেশের তৃতীয় জেলা যশোর, তাদের উৎপাদন ২ লাখ ৪৮ হাজার টন। চতুর্থ অবস্থানে থাকা ভোলায় ১ লাখ ৫৭ হাজার টন এবং পঞ্চম অবস্থানে থাকা সাতক্ষীরায় ১ লাখ ৫৬ হাজার টন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। মাছ উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, প্রাকৃতিকভাবেই কুমিল্লার মাটি ও পানি মাছ চাষের জন্য উপযোগী। ১৯৮৬ সালের দিকে উপজেলার ধানুয়াখলা গ্রামের আদর্শ মৎস্য প্রকল্প নাম দিয়ে কয়েকজন অলস জমিগুলোতে মাছ চাষের উদ্যোগ নেন। এই কাজে অগ্রভাগে থাকা সুনীল কুমার রায়সহ কয়েকজন পানিতে ডুবে থাকা জমিগুলোকে কাজে লাগান। ৩০০ বিঘা জমিতে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন তাঁরা, এতেই আসে সাফল্য। মাছ চাষের লাভের একটি অংশ জমির মালিকদেরও দেওয়া হয়। শুরু থেকেই সাফল্য পেয়েছে মাছ চাষের এই পদ্ধতি। জেলা মৎস্য বিভাগ বলছে, এখানে উৎপাদিত মাছের মধ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশই পাঙাশ আর তেলাপিয়া। বাকি মাছের মধ্যে আছে রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভার কার্প। এ বিষয়ে জেলা মৎস্য কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক অশোক কুমার দাস বলেন, প্লাবনভূমিতে মাছ চাষে কুমিল্লা দেশের মডেল। প্রথমে দাউদকান্দি থেকে শুরু হলেও পরে তা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের উপজেলা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। জাতীয় পরিবেশ পদক প্রাপ্ত কুমিল্লার কৃষি ও পরিবেশ সংগঠক মতিন সৈকতের বাড়ি দাউদকান্দির আদমপুর গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, একসময় বছরের অধিকাংশ সময় অলস পড়ে থাকা জমিগুলো থেকে এখন মৌসুমে বিক্রি হচ্ছে হাজার কোটি টাকার মাছ। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. বেলাল হোসেন বলেন, তাঁরা মাছ চাষিদের প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেন। প্রতিবছর জলাশয়ে ৬ থেকে ৭ টন মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জেলার ৬টি উপজেলায় অভয়াশ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে। বছরে অন্তত দেড় হাজার চাষিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উদ্যোগে এসেছে সাফল্য কুমিল্লা জেলায় মৎস্য খাতে অবদানের জন্য এখন পর্যন্ত কয়েকজন পেয়েছেন জাতীয় মৎস্য (স্বর্ণ) পদক। সর্বশেষ ২০২৫ সালে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে দাউদকান্দি উপজেলার সিংগুলা গ্রামের মোহাম্মদ রহমত আলীর নাম। রহমত আলী বলেন, ১৯৯৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর তিনি কিছুদিন মাছ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ২০০০ সালে পাশের রায়পুরে ৩০ শতাংশ পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। পুঁজি ছিল মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। সব খরচ বাদ দিয়ে প্রথম বছর ভালো লাভ হওয়ায় তাঁর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। পরের বছর ৩ একরের একটি পুকুর ইজারা নিয়ে রহমত ফিশারিজ নামে একটি মৎস্য খামার গড়ে তোলেন। বাড়তে থাকে মাছ চাষের পুকুর ও প্লাবনভূমির পরিমাণ। বর্তমানে তিনি বছরে অন্তত আড়াই হাজার টন মাছ উৎপাদন করেন। এই খাতে তাঁর বিনিয়োগ সাত কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। তাঁর এখানে কাজ করেন ৬০ জন শ্রমিক। মাছ উৎপাদনে কুমিল্লার অবস্থান ধরে রাখার পেছনে জেলা মৎস্য বিভাগের বিভিন্ন উদ্যোগ আছে।

(সূত্র: প্রথম আলো, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫)

"বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করি
নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করি

দেশীয় জাত ও আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অগ্রযাত্রা

বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য হ্রাস, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং রপ্তানির সম্ভাবনা–সব ক্ষেত্রেই খাতটি জাতীয় উন্নয়নের একটি শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হচ্ছে 'জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫', যার প্রতিপাদ্য 'দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি'। দেশীয় জাতের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগ, রোগ প্রতিরোধ ও প্রাণীর সমন্বিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সেবা বিস্তার, গবেষণালব্ধ নতুন জ্ঞানের ব্যবহার–এসব বিষয়ে দেশের খামারি ও উদ্যোক্তাদের সচেতনতা বাড়াতে এবার প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হচ্ছে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ। ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাত দেশের অর্থনীতিতে সুনির্দিষ্ট স্থান ধরে রেখেছে। স্থির মূল্যে জিডিপিতে খাতটির অবদান ১.৮১ শতাংশ, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৯ শতাংশ, কৃষিজ জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১৬.৫৪ শতাংশ। অর্থমূল্যে প্রাণিসম্পদ জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ৯১ হাজার ৩৬ কোটি টাকা, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি জাতীয় প্রবৃদ্ধিতেও সরাসরি অবদান রাখছে। বর্তমানে দেশে প্রায় আড়াই কোটি গরু, ১৫ লাখ মহিষ, তিন কোটি ছাগল-ভেড়া এবং ৪০ কোটি হাঁস-মুরগি পালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে উৎপাদিত হয়েছে এক কোটি ৫৫ লাখ মেট্রিক টন দুধ, ৮৯.৫৪ লাখ মেট্রিক টন মাংস এবং দুই হাজার ৪৪০ কোটি ডিম, যা দেশের পুষ্টি নিরাপত্তা, প্রোটিন চাহিদাপূরণ ও খাদ্য ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে দুই লাখ ৭৮ হাজার ২৪২টি গরু-মহিষ খামার, আট লাখ ৬৮ হাজার ৪০০টি ছাগল-ভেড়া খামার এবং এক লাখ ৯১ হাজার ৭০০টি পোল্ট্রি খামার কার্যক্রম চালু রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ৪৫৮টি হ্যাচারি ও ৩৩৮টি ফিড মিল, যা কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বাংলাদেশে মাংস ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত শিল্প সম্প্রসারণ লাভ করেছে; দেশে রয়েছে ১১টি মাংস এবং ১২টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল, যা প্রমাণ করে দারিদ্র্য হ্রাস, টেকসই কর্মসংস্থান ও জাতীয় অর্থনীতির জন্য খাতটি একটি শক্তিশালী চালিকাশক্তি। দেশীয় জাতের গবাদি পশুর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি বড় ভূমিকা পালন করছে। শুধু সরকার নয়, বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এই কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ায় দেশি গবাদি পশুর জিনগত উন্নয়ন ও উৎপাদনক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাণিস্বাস্থ্যের যত্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন রোগ-বালাই এখনো খাতটির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর ১৭ ধরনের রোগের প্রায় ৩৪ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও সারা দেশে বিতরণ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভূত লাম্পি স্কিন ডিজিজ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রায় ১৭ লাখ ডোজ টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে রোগটির বিস্তার রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখা হচ্ছে। একই সঙ্গে ক্ষুরারোগ নির্মূলের লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ ও ভোলা জেলাকে 'মুক্ত অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিত করে নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ছাগলের অন্যতম প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ পিপিআর নিয়ন্ত্রণেও অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় ছয় কোটি ডোজ টিকা মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়েছে, যা রোগটি নির্মূলে বড় ধরনের আশার বার্তা দিচ্ছে। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সুষম খাদ্যের নিশ্চয়তা। দেশে এই খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলায় উন্নত জাতের ঘাস, ফডার শস্য ও ভুট্টা চাষে খামারিদের উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় বীজ-কাটিং সরবরাহে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নেও রয়েছে বড় সম্ভাবনা। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকা এবং সিলেট-সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলে মহিষের প্রাপ্যতা বেশি হওয়ায় এসব এলাকায় মহিষ পালন সম্প্রসারণের সুযোগ ব্যাপক। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল এরই মধ্যে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃতি পাওয়ায় এর মাংস ও চামড়া রপ্তানিতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। দেশে বছরে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বর্গফুট চামড়া উৎপাদিত হয়, যার রপ্তানি আয় প্রায় ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। তবে চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বর্তমান সময়ের প্রয়োজন। তবে সব অগ্রগতির পরও প্রাণিসম্পদ খাতটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, প্রাণিজাত খাদ্যের অপ্রতুলতা, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স, জুনোটিক রোগ এবং উদীয়মান-পুনরুদীয়মান রোগ নিয়ন্ত্রণের মতো বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিশেষজ্ঞদের মতে, উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রাণিসম্পদ খাতকে আরো শক্তিশালী ভিত্তির দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি ও গবেষণা, নিরাপদ পণ্য উৎপাদন, নারী উদ্যোক্তা তৈরি, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং বাজার সম্প্রসারণ–এসব মিলিয়ে প্রাণিসম্পদ খাত বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠছে। প্রান্তিক খামারিদের দক্ষতা ও উদ্যোগই এই সমৃদ্ধির মূলশক্তি। প্রাণিসম্পদ উন্নত হলে অর্থনীতি শক্তিশালী হবে, পুষ্টি নিরাপত্তা বাড়বে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। তাই বলা যায়, প্রাণিসম্পদে উন্নতি মানেই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। **(লেখক: মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়)**

সাগরে নতুন ৬৫ প্রজাতির মাছের সন্ধান

দেশের সমুদ্রসীমায় নতুন আরও ৬৫ প্রজাতির মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ৫ প্রজাতির মাছ সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেখা গেছে। এত দিন সাগরে মোট ৪৭৫ প্রজাতির মাছ পাওয়া যেত। আগের প্রজাতির সঙ্গে এখন নতুন করে এসব মাছের প্রজাতি যুক্ত হবে। এসব মাছের পূর্ব ইতিহাস এবং গোত্র নির্ধারণের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। আবার প্রথমবারের মতো দেশের সমুদ্রসীমায় টুনা মাছের উপস্থিতিও পাওয়া গেছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) যৌথ উদ্যোগে করা মৎস্যসম্পদ জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। সভাপতিত্ব করেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুর রউফ। এফএও এর সহায়তায় ৮টি দেশের ২৪ জন বিজ্ঞানীর মাধ্যমে মাসব্যাপী এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। জাতিসংঘের একটি গবেষণা জাহাজ এ বছরের ২১ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে বঙ্গোপসাগরের ৬৮টি স্টেশন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপ দলের নেতৃত্বে ছিলেন নরওয়ের বিজ্ঞানী এরিক ওলসেন। বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আবদুল্লাহ আল মামুন। গবেষণা দলে যুক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সায়েদুর রহমান চৌধুরী। জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ সীমানায় প্রথমবারের মতো টুনা মাছের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। মাছের পাশাপাশি টুনা মাছের লার্ভা বা বাচ্চাও পাওয়া গেছে। এটার জন্য দেশের মানুষ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছে। এখন টুনা মাছ ধরার জন্য দেশি-বিদেশি বা যৌথ বিনিয়োগ করা যাবে। দেশের সাগরের মাত্র ২০০ মিটার গভীরে মাছ ধরা গেলেও সাগরের ৭০০ মিটার নিচেও মাছের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। আর নতুন প্রজাতির ৬৫ জাতের মাছের বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার গবেষণাগারে পাঠানো হয়েছে। সাগরের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় মাছ ধরা হলেও গভীর সাগরে কোনো মাছ ধরা হচ্ছে না জানিয়ে তিনি গভীর সাগর থেকে মাছ ধরার উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন। জরিপে বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ সীমানায় প্রথমবারের মতো টুনা মাছের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। কমে গেছে সাগরের পানির ওপরের স্তরের ছোট আকৃতির (স্মল প্যালাজিক) মাছের পরিমাণও। এদিকে জরিপে বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ আহরণ কমে যাওয়ার তথ্যও উঠে এসেছে। দেশের প্রধান ২০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ২০১৮ সালে ৯ প্রজাতির মাছ আহরণের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উপযোগিতা ছিল, কিন্তু এবার তা ৫টিতে নেমে এসেছে। জরিপের তথ্যে বলা হয়, সাগরের পানির ওপরের স্তরের ছোট আকৃতির (স্মল প্যালাজিক) মাছের পরিমাণও কমে এসেছে। ২০১৮ সালে যেখানে স্টক ছিল ১ লাখ ৫৮ হাজার টন, ২০২৫ সালে তা নেমে এসেছে মাত্র ৩৩ হাজার ৮১১ টনে। একইভাবে ২০১৮ সালে গভীর সাগরে জেলি ফিশের উপস্থিতি থাকলেও এখন তা উপকূলের কাছাকাছি চলে এসেছে। ফলে জেলেদের জাল জেলি ফিশে ভরে যাচ্ছে। জরিপের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে অধ্যাপক সায়েদুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'সাগরের ৮০ থেকে ৯০ মিটারের পর অক্সিজেনের মাত্রা কম। কিছু জায়গায় অক্সিজেন নেই বললেই চলে। তবে সাগরে প্রচুর উদ্ভিদের উপস্থিতি দেখা গেছে। আমাদের জাহাজ সাগরের উপকূলের ২০ মিটারের নিচে নামতে পারে না। তাই উপকূলের কোনো তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি।' প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, 'নতুন এ জরিপের ফলাফল আমাদের সমুদ্র ব্যবস্থাপনা, নতুন পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণে সহায়তা করবে। বঙ্গোপসাগরে গবেষণার সক্ষমতা বাড়াতে নতুন জাহাজ কেনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই এটা করতে হবে।' **(সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ৩ ডিসেম্বর ২০২৫)**

দেশের পুষ্টি ও অর্থনীতিতে গ্রামীণ নারীদের অবদান অপরিসীম

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, গ্রামীণ নারীরা হাঁস, মুরগি, গরু ও ছাগল পালন করে একদিকে যেমন

অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন, অন্যদিকে ডিম, দুধ ও মাংস সরবরাহের মাধ্যমে পুষ্টির যোগান নিশ্চিত করছেন। তাই দেশের পুষ্টি ও অর্থনীতিতে গ্রামীণ নারীদের অবদান অপরিসীম। উপদেষ্টা শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত "জলবায়ু অভিযোজনে গ্রামীণ নারী"-শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, মাইক্রোলেভেলে পুষ্টির অধিকাংশ অবদানই গ্রামীণ নারীদের। যদি তারা এসব প্রাণী পালন না করতেন, বাংলাদেশ কখনই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারত না। তাই গ্রামীণ নারীদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, নারীরা ঠিকই আছেন, কিন্তু তাদের সামনে আনা হয় না। এমন নয় যে নারীরা নেই–বরং তাদের অবদানকে দৃশ্যমান করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যদি নারীদের সামান্য উৎসাহ ও সহায়তা দিতে পারি, তবে তাদের ভূমিকা আরও দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। জেলেদের প্রাপ্য মজুরি প্রসঙ্গে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, দাদন প্রক্রিয়ার কারণে আমাদের জেলেরা ন্যায্য মজুরি পায় না। এটি এখন একটি গুরুতর সমস্যা। দাদন প্রথার অবসান জরুরি, এজন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জেলে পরিবারের নারীদের স্বীকৃতি দেওয়াও সমানভাবে জরুরি। বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, বাল্যবিবাহ রোধ না করতে পারলে গ্রামীণ নারী শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারবে না। এজন্য জাতীয় পরিকল্পনা থাকা উচিত। **(সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, ৩১ অক্টোবর ২০২৫)**

মাছের নিরাপদ প্রজনন ও ডলফিন সংরক্ষণে হালদা নদীকে 'মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা

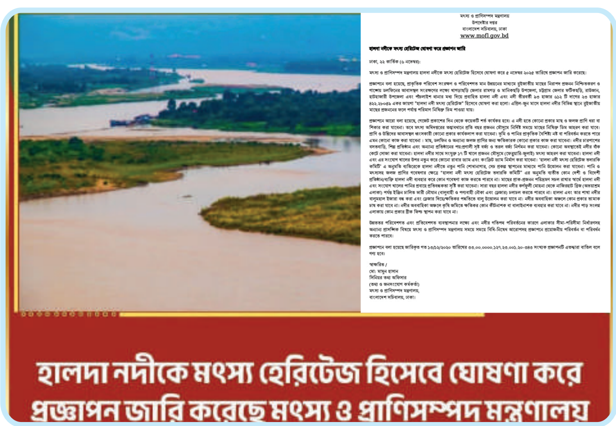

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হালদা নদীকে 'মৎস্য হেরিটেজ' হিসেবে ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। বুধবার (৫ নভেম্বর) এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে রুই জাতীয় মাছের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিতকরণ ও গাঙ্গেয় ডলফিনের আবাস সংরক্ষণের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ির রামগড় ও মানিকছড়ি উপজেলা,চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, রাউজান, হাটহাজারী উপজেলা এবং পাঁচলাইশ থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হালদা নদী এবং নদী তীরবর্তী ৯৩ হাজার ৬১২টি দাগের ২৩ হাজার ৪২২.২৮০৫৯ একর জায়গাকে 'হালদা নদী মৎস্য হেরিটেজ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এপ্রিল থেকে জুন মাসে হালদা নদীর বিভিন্ন স্থানে রুই জাতীয় মাছের প্রজননের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিষিক্ত ডিম পাওয়া যায়। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, গেজেট প্রকাশের দিন থেকে নদীতে কিছু শর্ত কার্যকর হবে। নদী থেকে কোনো প্রকার মাছ বা জলজ প্রাণী ধরা বা শিকার করা যাবে না। তবে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর প্রজনন মৌসুমে নির্দিষ্ট সময়ে মাছের নিষিক্ত ডিম আহরণ করা যাবে। প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্তকারী কোনো কার্যকলাপ করা যাবে না। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে পারে এমন কোনো কাজ করা যাবে না। মাছ, ডলফিন ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকারক কোনো কার্যক্রম নিষিদ্ধ। নদীর চারপাশের বসতবাড়ি, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী ও তরল বর্জ্য নির্গমন করা যাবে না। নদীর বাঁক কেটে সোজা করা যাবে না। হালদা নদীর সাথে সংযুক্ত ১৭টি খালে প্রজনন মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-জুলাই) মৎস্য আহরণ করা যাবে না। হালদা নদী এবং এর সংযোগ খালের ওপর নতুন রাবার বা কংক্রিট ড্যাম নির্মাণ করা যাবে না। 'হালদা নদী মৎস্য হেরিটেজ তদারকি কমিটি'র অনুমতি ছাড়া হালদা নদীতে নতুন পানি শোধানাগার বা সেচ প্রকল্প স্থাপন করে পানি উত্তোলন করা যাবে না। পানি ও মৎস্যসহ জলজ প্রাণীর গবেষণায় কোনো দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এই কমিটির অনুমতি ছাড়া নদী ব্যবহার করতে পারবে না। মাছের প্রাক-প্রজনন পরিভ্রমণ সচল রাখার স্বার্থে নদী ও সংযোগ খালের পানির প্রবাহে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যাবে না। সারা বছর হালদা নদীর কর্ণফুলী মোহনা থেকে নাজিরহাট ব্রিজ (অভয়াশ্রম এলাকা) পর্যন্ত ইঞ্জিন চালিত ভারী নৌযান (বালুবাহী ও পণ্যবাহী নৌকা, ড্রেজার) চলাচল করতে পারবে না। হালদা এবং তার শাখা নদীতে বালুমহাল ইজারা বন্ধ করা হবে এবং ড্রেজার বা ক্ষতিকর পদ্ধতিতে বালু উত্তোলন করা যাবে না। নদীর অববাহিকা অঞ্চলে কোনো প্রকার তামাক চাষ করা যাবে না। কৃষি জমিতে ক্ষতিকর কীটনাশক বা বালাইনাশক ব্যবহার করা যাবে না। নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকায় কোনো ব্রিক ফিল্ড স্থাপন করা যাবে না। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, উন্নততর পরিবেশগত ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে এলাকার সীমা-পরিসীমা নির্ধারণসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজন অনুসারে বিধি-নিষেধ আরোপ বা প্রজ্ঞাপনে পরিবর্তন করতে পারবে। **(সূত্রঃ বিজনেস স্টান্ডার্ড, ০৬ নভেম্বর ২০২৫)**

স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামে ডিম যুক্ত করতে হবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামে ডিম যুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, আমাদের স্কুল ফিডিংয়ে দুধ দেওয়া হচ্ছে সেখানে ডিমও যুক্ত করতে হবে। কেননা অনেক দারিদ্র্য ছেলে-মেয়ে পুষ্টির যোগান পায় না। সেক্ষেত্রে স্কুলের খাবার তালিকায় ডিম অন্তর্ভুক্ত করা হলে শিক্ষার্থীদের অপুষ্টি দূরীকরণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উপদেষ্টা শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি)-তে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন সেন্ট্রাল কাউন্সিল ও ওয়ার্ল্ড পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন বাংলাদেশ শাখার আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, ডিম এমন এক খাবার যা দেশের প্রায় সব শ্রেণির মানুষ কোনো না কোনোভাবে এর সাথে জড়িত। এর উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোগ পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরে মানুষের অংশগ্রহণ রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, গরুর মাংস সবাই ক্রয় করতে না পারলেও ডিম এমন একটি সাশ্রয়ী খাদ্য যা, সকলের নাগালে। উপদেষ্টা বলেন, শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে ছয় বছর বয়সের মধ্যেই প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেওয়া জরুরি। তাই স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামে ডিম যুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, দেশের ৮০ শতাংশ ডিম প্রান্তিক খামারিদের কাছ থেকে আসে। গ্রামীণ দরিদ্র্য নারীরাও দু-একটি করে মুরগি পালন করে নিজেদের পরিবারের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টি সরবরাহে অবদান রাখছেন। কৃষিতে কীটনাশক ব্যবহারে মুরগি পালন হুমকির মুখে পড়েছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন উপদেষ্টা। তাছাড়া হাওরের হাঁসের ডিমের কথা প্রচার করা হচ্ছে না উল্লেখ করে তিনি সংশ্লিষ্টদের হাওরের হাঁসের ডিমের বিষয়ে প্রচার বাড়ানোর আহ্বান জানান। ডিম খেলে ক্যান্সার কমে-এই বার্তাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। তিনি বলেন, ডিমের মূল্য বাড়ানোর সাথে জড়িত অনিয়ম ও অসাধু কাজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো.আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইলিয়াস হোসেন ও অধ্যাপক ড. মাহমুদুল হাসান সিকদার। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার (তথ্য ও জনসংযোগ কার্যকর) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

মাছের চিপস বানিয়ে মাসে লাখ টাকা মুনাফা নাজমা আক্তারের

করোনার শুরুর দিকে অনলাইনে ব্যবসা শুরু করেন অনেকেই। লাভও করেন। সে ভাবনা থেকে ২০২০ সালে উদ্যোক্তা নাজমা আক্তার অনলাইনে মেয়েদের রূপচর্চার সামগ্রীর ব্যবসা শুরু করেন। অনলাইনে ব্যবসার জন্য পালংকি কন্যা নামে একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করেন। সে সময় রূপচর্চার সামগ্রী বিক্রি করে দুই মাসে ৫০ হাজার টাকা মুনাফা করেন। এই মুনাফা বদলে দেয় নাজমা আক্তারের জীবন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কক্সবাজারের কলাতলী আদর্শগ্রামে থাকতেন নাজমা আক্তার। অবসরপ্রাপ্ত বাবার পেনশনের টাকা দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম অবস্থা। তাই নিজে কিছু করার ইচ্ছা থেকে অনলাইনে ব্যবসা শুরু করেন নাজমা। এরপর ইন্টারনেট ও ইউটিউবে নতুন ব্যবসার ধারণা খুঁজতে থাকেন। একপর্যায়ে জোনাকি পোকার গুঁড়া তৈরির একটি ভিডিও দেখেন। তখন ধারণা আসে সামুদ্রিক মাছের গুঁড়া তৈরির। প্রথম চেষ্টায় কয়েক দফায় ব্যর্থ হন। তবে একসময় মাছের গুঁড়া তৈরি ও বিক্রি শুরু করেন। অনলাইনে বিক্রিও বাড়তে থাকে। ব্যবসা করতে গিয়ে এই পণ্যের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন তিনি। তাই মাছ ধরার নির্দিষ্ট মৌসুম ছাড়া এই পণ্য তৈরি করেন না। একপর্যায়ে ব্যবসা বড় করতে ২০২৪ সালে মাছের চিপস তৈরির পরিকল্পনা করেন নাজমা আক্তার। নিজের বাসায় বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক ও মিঠাপানির মাছ দিয়ে চিপস তৈরির চেষ্টা করেন। প্রথমে টুনা ও পোয়া মাছের চিপস বানানোর চেষ্টা করেন। কয়েকবারের চেষ্টায় তাতে সফল

হন তিনি। তারপর 'ফিসো ফিস চিপস' নামে সামুদ্রিক মাছ থেকে তৈরি চিপসের একটি ব্র্যান্ড গড়ে তোলেন। বর্তমানে তিন রুমের একটি ভাড়া বাসায় কারখানা ও অফিস রয়েছে নাজমার। সেখানেই এই মাছের চিপস তৈরি করেন তিনি। বর্তমানে প্রতি মাসে ৭০০ কেজি মাছের চিপস বিক্রি করেন। সব খরচ বাদ দিয়ে মাসে লাখ টাকার বেশি মুনাফা থাকে নাজমার। তাঁর প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন সাতটি পরিবারের সদস্য। এ ছাড়া ৩০ জন নারীকে মাছের চিপস তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। নাজমা আক্তার বলেন, 'এই চিপস দিয়ে বাচ্চাদের চিপস খাওয়ার বায়না মেটে। অন্যদিকে পুষ্টির চাহিদাও পূরণ হয়। আমাকে এই চিপস অনেকেই বিদেশে রপ্তানি করার কথা বলে। তবে আমি আগে দেশের চাহিদা মেটাতে চাই। পরে রপ্তানি নিয়ে ভাববো। আগামী কয়েক বছরে আমি আরও বড় পরিসরে চিপস উৎপাদনে যেতে চাই।' **(সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫)**

মহিষ দেশের সম্পদ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, মহিষের দই বাংলাদেশের জিআই পণ্য হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে। মহিষ দেশের সম্পদ, কিন্তু দীর্ঘদিন অবহেলিত থেকেছে-এ অবহেলা যেন আর না হয়, সরকারের পক্ষ থেকে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। তিনি বলেন, মহিষের দুধ থেকে শুধু দই নয়, চিজসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে খামারিদের আয়ের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। এসব পণ্য রপ্তানিযোগ্য হিসেবেও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উপদেষ্টা বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে সাভারের মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামারে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বাফেলো অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত "বৈজ্ঞানিক সম্মেলন- ২০২৫"- এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ মিলিয়েই খাদ্য উৎপাদন গড়ে ওঠে। কিন্তু অনেকেই খাদ্য উৎপাদন বলতে কেবল কৃষিকেই বোঝেন। কৃষিতে কীটনাশক ও আগাছানাশকের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় গরু, ছাগল, মহিষ ঘাস খেতে পারছে না। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নামে মহিষের চারণভূমি হ্রাস পাচ্ছে, যা মোটেও কাম্য নয়। তিনি এসময় কীটনাশক ব্যবহারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন এবং খাদ্য উৎপাদনে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, গবাদিপশুর তালিকায় মহিষকে যথাযথভাবে স্থান দেওয়া হয়নি। প্রাণিসম্পদ খাতে মহিষের গুরুত্ব এখনো অবমূল্যায়িত। দেশে মহিষের সংখ্যা কমে যাওয়া উদ্বেগজনক; চারণভূমির অভাব মহিষ পালনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ বাফেলো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নীলুফা আক্তার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। সম্মেলনে ড. প্রীতিশ ভারতের হরিয়ানায় প্রান্তিক কৃষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মুরাহ মহিষ ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এছাড়া, ড. হিরন্ময় বিশ্বাস ইতালির দুধ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে টেকসই মহিষের দুধ উৎপাদনের সম্ভাবনা তুলে ধরেন। এসময় স্বাগত বক্তৃতা প্রদান করেন ড. গৌতম কুমার দেব। এরপর দুপুরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা সাভারে অবস্থিত কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার চত্বরে নবনির্মিত কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরির উদ্বোধন করেন এবং উদ্বোধন শেষে উপদেষ্টা ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন এবং এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও আধুনিক সুবিধা ঘুরে দেখেন। এসময় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান, কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পরিচালক মো. শাহজামান খানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

দৃষ্টিজয়ী ফাহিম ফেরদৌসের জীবনের গল্প

অন্ধ হয়েও জীবন থামেনি যুবক ফাহিম ফেরদৌসের। মাত্র সাত বছর বয়সে এক জ্বরের পর তার দু চোখ অন্ধ হয়ে যায়। দিন মজুর বাবা বহু চিকিৎসা করেও ভালো করতে পারেনি তার চোখ। পড়াশুনা না করলেও ধীরে ধীরে সংসারে সব কাজ আয়ত্ব করেছে ফাহিম। ফাহিম সংসারের কারও বোঝা হতে চায়নি। গরিব বাবা ফজলার রহমানের কাছে গরু পালন করা শিখেছে। বর্তমানে তার ফার্মে প্রায় ছয়টি গরু আছে। তা দিয়ে চলে তার সংসার। গরু পালন করে নিজের আত্মকর্মসংস্থানের পথ বেছে নিয়েছে সে। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নের কালে মৌজা

গ্রামের দিনমজুর ফাহিম ফেরদৌস। অভাবের সংসার তাদের। তিনভাই বোন মিলে কষ্টে দিন কাটে তার। বাকি ভাই বোন লেখাপড়া শিখলেও অন্ধ ফাহিমের জীবন চলে অন্ধকারে কিন্তু থেমে থাকার ছেলে ফাহিম নয়। অসম্ভব মানসিক শক্তি তার। সংসারের কারও করুণার পাত্র হতে চায়নি সে। খুব ছোট বেলা থেকেই পরিবারের সকলের কাছে সংসারের সব কাজ আয়ত্ব করে সে। এক সময় বাবার সহয়তায় গরু পালন শুরু করে। খুব ভোরে ঘুম থকে উঠেই গরুকে খাবার দেয়া, ঘর পরিষ্কার করা, খড় কাটা, গরুকে গোছল করানোসহ সব কাজ একাই করে। এভাবে তার খামারে দুটো গরু থেকে এখন ছয়টি গরু হয়েছে। প্রতিবছর এক অথবা দুটি গরু মোটাতাজা করে বিক্রি করে। এতে যে আয় হয় তা দিয়েই তার সংসার চলে। বর্তমানে গরুগুলোর দাম প্রায় তিন লাখ টাকা। আলোহীন চোখে বেকার না থেকে ফাহিমের সারাদিন কাটে খামারের কাজে। এখন তার বয়স ২২ বছর। সে গরু" দেখার পাশাপাশি মায়ের কাজেও সহযোগিতা করে। দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও সমাজের আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের মতো চলাফেরা করে। ফাহিম এখন তিন ভাই-বোনের মধ্যে সংসারে একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি। জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মো. হাবিবুর রহমান জানান, ফাহিম বেলগাছা ইউনিয়নের অধিবাসী। আমি বিভিন্ন সময় ঐ খামার পরির্দশন করেছি। তাকে আমরা বিভিন্ন সময় টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়ে আসছি। কিছুদিন আগে তাকে খরকাটার মেশিন ও জেলা পরিষদ থেকে ১০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছি। ভবিষ্যতে তাকে বিভিন্ন সহায়তা দেয়া হবে। **(সূত্রঃ দৈনিক সকালের সময়, ০৮ নভেম্বর ২০২৫)**

ইলিশ রক্ষায় জাটকা শিকারে ৮ মাস মেয়াদি নিষেধাজ্ঞা কার্যকর

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে ১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হচ্ছে দেশব্যাপী জাটকা ইলিশ আহরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আগামী ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত চলবে এই ৮ মাস মেয়াদি" নিষেধাজ্ঞা। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় ২৫ সেন্টিমিটারের ছোট ইলিশ (জাটকা) আহরণ, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও মজুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। এর আগে ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর ২০২৫ (১৯ আশ্বিন থেকে ৯ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে প্রজননক্ষম ইলিশ রক্ষায় 'ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২৫' বাস্তবায়ন করা হয়। ওই সময়ে ডিমওয়ালা ইলিশ থেকে নিঃসৃত ডিমের পরিস্ফুটনের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা বর্তমানে উপকূলীয় নদ-নদী ও মোহনাসমূহে বিচরণ করছে। এসব পোনা নিরাপদে বেড়ে উঠতে পারলেই ভবিষ্যতে দেশের ইলিশ উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে। মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ (সংশোধিত) আধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী, উক্ত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে অনধিক ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর সারাদেশে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, নৌপুলিশ, র‍্যাব, ও স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় কঠোরভাবে এ নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করবে। **(সূত্রঃ মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

সম্মানিত লেখকদের প্রতি আহ্বান :

প্রিয় সুহৃদ,

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর হতে "আমিষ বার্তা "নামে একটি ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের সৃজনশীল এই যাত্রায় আপনাকে স্বাগত। আমাদের ম্যাগাজিনের আসন্ন ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। আপনি যদি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উদ্ভাবন, সফলতার গল্প ও প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে লিখতে চান, তাহলে আমাদের সঙ্গে লেখা পাঠিয়ে যুক্ত হন।

* লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ১৫ ই মার্চ ২০২৬
* লেখার পরিমাণ: সর্বোচ্চ ১২০০ ওয়ার্ড (অবশ্যই সুতনী এম জে ফন্ট ব্যবহার করতে হবে)
* লেখার সঙ্গে লেখকের পূর্ণ পরিচয় ও পাসপোর্ট সাইজের ছবি(সফট কপি)
* ইমেইল /যোগাযোগ: headquarter@flid.gov.bd ০১৭১৭৬০৮৬২২ **(Whats app)**

আপনার লেখাই হতে পারে আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

দৈনিক দুইশ লিটার দুধ ও কোরবানিতে দেড় কোটি টাকার গরু বিক্রি

গরু পালন বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী পেশা। এই পেশার মাধ্যমে একদিন নিজের ও পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার স্বপ্ন দেখেছিলেন মো. জসিম উদ্দিন। কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার ধনেশ্বর গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এই সংগ্রামী মানুষটি আজ তার দৃঢ় মনোবল ও পরিশ্রমের মাধ্যমে হয়ে উঠেছেন সফল উদ্যোক্তা। জসিম উদ্দিনের জন্ম হয়েছিল কৃষকের ঘরে। ছোটবেলা থেকেই তিনি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রাথমিক থেকে শুরু করে এইচএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করলেও, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। তবে তিনি থেমে যাননি। কৃষি কাজের পাশাপাশি গরু পালন শুরু করেন। প্রথমে পারিবারিক প্রয়োজনে শুরু হওয়া এই কাজটি ধীরে ধীরে তার স্বপ্নে পরিণত হয়। তিনি তার তিন ছেলে সন্তানের পড়াশোনার খরচ চালানোর পাশাপাশি সংসার চালানোর জন্য গরু খামারকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ ছিল তার সন্তানদের শিক্ষিত করা। বর্তমানে তার এক ছেলে একটি ব্যাংকে চাকরি করছেন, যা পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে এবং খামারের প্রসারে সহায়তা করেছে। চার বছর আগে জসিম উদ্দিন তার ছেলেদের সহায়তায় ০২ টি গরু নিয়ে আল হেরা এগ্রোটেক ফার্মের যাত্রা শুরু করেন। লক্ষ্য ছিল খামারকে একটি আধুনিক ও মডেল খামারে রূপান্তরিত করা। বর্তমানে খামারে ছোট-বড় মিলে ৫০টি গরু রয়েছে। এসব গরুর মধ্যে দেশি, জার্সি এবং হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের গরু রয়েছে। খামারের গরুগুলোর সুস্থতা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে তিনি অত্যন্ত যত্নশীল। খাদ্য হিসেবে গরুদের ভুষি, খৈল, চালের কুঁড়া, সয়াবিন, সবুজ ঘাস এবং খড় খাওয়ান। খামারের ৮ শতক জমিতে নিজেই সবুজ ঘাস চাষ করেন। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য খামারে একটি কোয়ারান্টাইন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে নতুন গরু আনার আগে এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ করা হয়। অসুস্থ গরুগুলোকে দ্রুত আলাদা করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এছাড়া, স্থানীয় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি গরুদের সুস্থ রাখেন। পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতি সপ্তাহে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করা হয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা পাইপলাইন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে খামারটি সবসময় পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর থাকে। বর্তমানে খামারের প্রতিটি গাভি থেকে দৈনিক ১৮ থেকে ২০ লিটার দুধ উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতিদিন মোট উৎপাদিত দুধের পরিমাণ ২০০ লিটার। দুধ স্থানীয় বেপারিদের কাছে এবং মিষ্টির দোকানে সরবরাহ করা হয়। গত কোরবানিতে ১.৫ কোটি টাকার গরু বিক্রি করা হয়েছে। খামারটি পরিচালনা করতে ০৫ জন শ্রমিক কর্মরত আছেন এবং তারা মাসে ২০,০০০ টাকায় কাজ করছেন। তিনি আরও জানান প্রাণিসম্পদ অফিসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করেন এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে গরুর জন্য একটি আধুনিক সেড নির্মাণ করে দিয়েছেন। মো. জসিম উদ্দিনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরও সুদূর প্রসারী। আসন্ন ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে তিনি খামারে ৫০টি ষাঁড় যোগ করার পরিকল্পনা করছেন, যেগুলো কোরবানির পশু হিসেবে বিক্রি করবেন। এছাড়া, উৎপাদিত দুধ এবং মাংস ব্যবহার করে একটি রেস্টুরেন্ট খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি গোবর ব্যবহার করে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনেরও পরিকল্পনা করছেন, যা খামারের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং অতিরিক্ত অংশ স্থানীয়দের সরবরাহ করা হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর থেকে তাকে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক লিফলেট প্রদান করা হয়েছে।

(প্রতিবেদনকারী: খালেক হাসান,কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, কুমিল্লা)

চিংড়ি খাতের বিদ্যুৎ বিলে ২০% ছাড় দেওয়া হবে

চিংড়ি খাতের বিদ্যুৎ বিলে ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। বৃহস্পতিবার (৩ ডিসেম্বর ২০২৫) চিংড়ি খাত পুনরুদ্ধারে নীতিসহায়তা বিষয়ক এক নীতি সংলাপে একথা জানান তিনি।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআরআই) এবং বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএফইএ) যৌথভাবে 'বাংলাদেশের চিংড়ি খাত পুনরুদ্ধারে নীতিসহায়তা রূপান্তর' শীর্ষক এই নীতি সংলাপের আয়োজন করে। পিআরআইএ এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরিদা আখতার ভর্তুকি ও প্রণোদনার মাধ্যমে চিংড়ি খাতের প্রতি বৈষম্য কমানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, শিগগিরই এই খাতের বিদ্যুৎ বিলে ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। এ ছাড়া একটি বিশেষায়িত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর বলেন, চিংড়ি খাতে বৃহৎ পুনর্গঠন ও শক্তিশালী মনিটরিং প্রয়োজন। এ ছাড়া রোগ ব্যবস্থাপনা, জাত উন্নয়ন ও এ খাতের সুশাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। পিআরআইএ এর গবেষণা পরিচালক ড. বজলুল হক খন্দকার অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, উৎপাদনশীলতা, মূল্য সংযোজন এবং খাত-নির্দিষ্ট প্রণোদনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিংড়িশিল্প ভারত, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। প্রতিযোগী দেশগুলো যখন স্বল্প সুদের ঋণ, বীমা, বন্ডেড গুদাম ও নানা ধরনের ভর্তুকি দিচ্ছে, তখন বাংলাদেশের সহায়তা ব্যবস্থা সীমিত রয়েছে। তাছাড়া ব্রুডস্টকের ওপর উচ্চ শুল্ক এবং চাষি ও প্রক্রিয়াকারকদের জন্য সীমিত অর্থায়ন বড় বাধা হিসেবেও রয়ে গেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে চিংড়ি রপ্তানি তিনগুণ বাড়ানোর আশা প্রকাশ করেন তিনি। আরও বক্তব্য দেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুর রউফ। **(সূত্রঃ দৈনিক আমাদের সময়, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫)**

ইসমাইলের মুরগির খামারে শতাধিক মানুষের কর্মসংস্থান

একজন সফল উদ্যোক্তা পোল্ট্রি খামারি আক্কেলপুর উপজেলার জামালগঞ্জের ইসমাঈল হোসেন টুকু। ২০০০ সালে তিনি তিনটি সেডে মাত্র ৫ হাজার সোনালি মুরগির বাচ্চা নিয়ে খামারের যাত্রা শুরু করেন। তারপর থেকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে তার তিনতলা ও ছয়তলা বিশিষ্ট ৮টি খামার আছে। সেখানে এখন ১ লাখের বেশি মুরগি উৎপাদন হচ্ছে। সফল খামারি ইসমাইল হোসেন টুকু বলেন, 'আমি শুরু থেকেই সোনালি মুরগি দিয়ে খামারের যাত্রা শুরু করি। এখনো সোনালি মুরগিই আছে। ৮টি খামারে সব মিলিয়ে ১২০ জন কর্মচারী কাজ করছেন। খামারে এখন সোনালি মুরগির বাচ্চা আছে ৩০ হাজার, পুলেট ২০ হাজার এবং লেয়ার ডিমের ৫০ হাজার। আক্কেলপুর উপজেলার রুকিন্দিপুর গ্রামের খামারি আইয়ুব আলী বলেন, 'আমি অন্য ব্যবসা করতাম। ইসমাইল হোসেন টুকু ভাইয়ের কাছ থেকে ৫০০ পিস সোনালি মুরগির বাচ্চা নিয়ে খামার শুরু করি। এখন তিনটি খামার আছে। সেখানে ১৫-২০ হাজার মুরগি পালন করি। খামার করতে টুকু ভাই আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। আমি এখন সফল খামারি। আমার খামারে এখন ৮ জন কর্মচারী নিয়মিত কাজ করছেন।' জয়পুরহাট সদর উপজেলার শাহাপুর গ্রামের খামারি নুরনবী বলেন, 'আমি বেকার ছিলাম। টুকু ভাইয়ের কাছ থেকে বাচ্চা বাকি নিয়ে খামার শুরু করি। মুরগি বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করতাম। এভাবেই খামারের সংখ্যা বাড়াই। আমি টুকু ভাইয়ের খামার দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন সফল খামারিতে পরিণত হয়েছি।' ইসমাইল হোসেন টুকুর খামারের কর্মচারী রাজু আহমেদ ও গোলাম মোর্শেদ বলেন, 'আমরা ভাইয়ের খামারে ৮ বছর ধরে কাজ করছি। সেখান থেকে যা পাই, তা দিয়েই সংসার ভালো চলছে।' আক্কেলপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আমিরুল ইসলাম বলেন, 'জয়পুরহাট তথা আক্কেলপুর উপজেলার মধ্যে ইসমাইল হোসেন টুকু সফল খামারি। তার দেখাদেখি এবং তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই মুরগি পালন করে সফল হয়েছেন। তার খামারসহ অন্য খামারগুলো আমরা নিয়মিত তদারকি করি। সব সময় তাদের পরামর্শ দিয়ে থাকি।'

(সূত্র : জাগো নিউজ, ২৪. কম. ২৬ অক্টোবর ২০২৫)

চিংড়ি ঘেরে নতুন স্বপ্ন, মাছ চাষে স্বাবলম্বী হচ্ছেন ডুমুরিয়ার নারীরা

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার গোনালী, সাজিয়াড়া, মাগুরাঘোনা, রুদাঘরা ও শোভনা গ্রামের প্রান্তিক নারীরা এখন মৎস্য বিভাগের অনুপ্রেরণায় নতুন স্বপ্ন দেখছেন – স্বাবলম্বী জীবনের স্বপ্ন। এক সময় যারা সম্পূর্ণভাবে স্বামীর আয়ে নির্ভর করতেন, আজ তারা

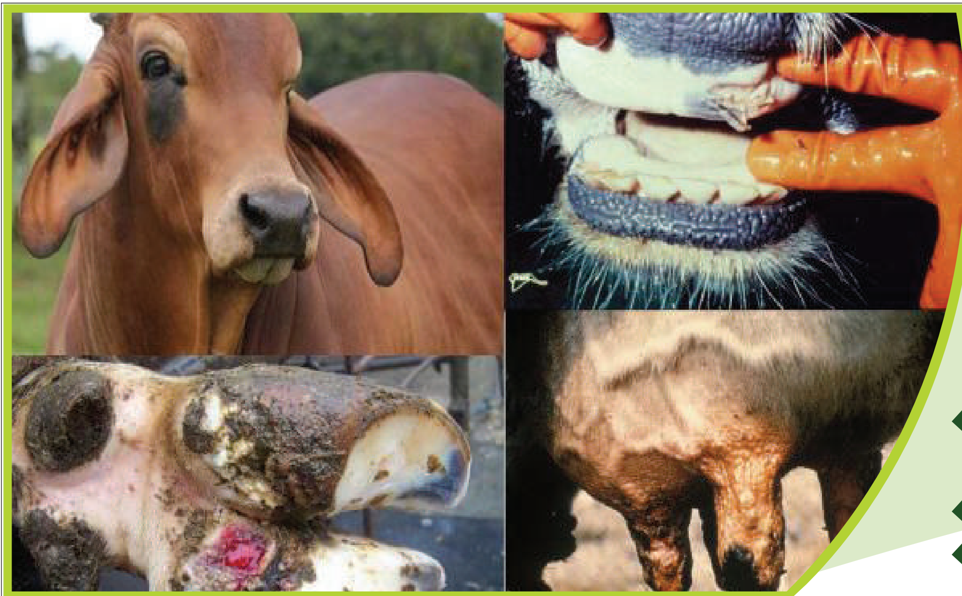

নিয়মিত টিকা প্রয়োগ করুন
ক্ষুরারোগ মুক্ত দেশ গড়ুন

ক্ষুরা রোগ (**Foot-and-Mouth Disease - FMD**) হলো গবাদিপশু; যেমনঃ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়ার একটি অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ যা মুখ ও পায়ের খুরে ঘা সৃষ্টি করে ফলে পশু খেতে পারে না, খুঁড়িয়ে হাঁটে যা পশুর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা এবং দুধ উৎপাদন কমিয়ে দেয়।

রোগের লক্ষণ

- প্রথমে জ্বর হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা (১০৫-১০৭ ফারেনহাইট) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
- জিহ্বা, দাঁতের মাড়ি, মুখের ভেতর এবং পায়ের খুরের মাঝে ফোসকা হয় পরে ফোসকা ফেটে লাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
- আক্রান্ত পশুর মুখ থেকে লালা পড়তে থাকে, ঠোঁটের নাড়াচড়ার ফলে সাদা ফেনা বের হতে থাকে এবং চপ চপ শব্দ হয়।
- ঘাস বা অন্য কিছু খেতে পারে না বলে পশু দুর্বল হয়ে পড়ে।
- ক্ষুরের ফোসকা ফেটে ঘা হয়, পা ফুলে ব্যথা হয়
- ক্ষত স্থানে মাছি ডিম পাড়ে ফলে পোকা হয়; পশু পা ছুড়তে থাকে যেন পায়ে কিছু লেগে আছে।
- গাভীর ওলানে ফোসকা হতে পারে, ফলে ওলান ফুলে উঠে এবং দুধ কমে যায়।
- বাছুরের এ রোগ হলে বাছুর প্রায়ই মারা যায়।
- পশুর শ্বাসকষ্ট, রক্ত শূন্যতা এবং পরিবেশগত উচ্চ তাপমাত্রায় অসহিষ্ণুতা দেখা যায়।
- দুধ ও মাংসের উৎপাদন হ্রাস পায়।
- গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাত হয় এবং বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে।

ক্ষুরারোগ প্রতিরোধে করণীয়

- আক্রান্ত পশুকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করে পরিষ্কার শুষ্ক জায়গায় রাখতে হবে।
- কোনো অবস্থাতেই কাদা বা পানিতে রাখা যাবে না।
- আক্রান্ত এলাকার এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল সুস্থ পশুকে অবিলম্বে টিকা দিতে হবে।
- আক্রান্ত পশুকে নরম ও তরল খাবার; যেমন-ভাতের ফ্যান বা জাউভাত খেতে দিতে হবে।
- যিনি আক্রান্ত পশুর সেবাযত্ন করবেন তার ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়, হাত-পা এবং ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিস অবশ্যই জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
- এ জন্য ১ লিটার পানিতে ৪ চা চামচ আইওসান মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে স্থানীয় পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চিকিৎসা করাতে হবে।
- মৃত পশুকে মাটির নিচে পুঁতে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- পশুর ঘর সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে।
- দৈনিক ২% আইওসান দ্রবণ দিয়ে বা অন্য কোনো সুবিধাজনক জীবাণুনাশক দ্রব্য মিশ্রিত পানি দ্বারা ধুয়ে দিতে হবে।
- সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ক্ষুরারোগ প্রতিরোধের জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ গবাদিপশুকে প্রতি ৬ মাস অন্তর এ রোগের টিকা দিয়ে নিতে হবে।

মনে রাখবেন, ক্ষুরারোগ একটি ভাইরাসজনিত রোগ, তাই এর প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (টিকা ও কোয়ারেন্টাইন) অনেক বেশি কার্যকর।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

নিজেরাই ঘেরে মাছ চাষ করে সংসার চালাচ্ছেন, সন্তানদের পড়াশোনা করাচ্ছেন এবং পরিবারে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছেন। গোনালী গ্রামের সাবিনা বেগম বলেন, "আগে আমার স্বামীর টাকার ওপরই নির্ভর করতে হতো, প্রতিটি পয়সা খরচের হিসাব দিতে হতো। যখন উপার্জনের সুযোগ পেলাম, চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি। এখন নিজের আয়ে চলি, সঞ্চয়ও করতে পারি।"তিনি ডুমুরিয়ায় মৎস্য বিভাগের কোস্টাল প্রকল্প থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিজ ঘেরে চিংড়ি চাষ শুরু করেছেন। তার স্বামী এখন আর সাগরে মাছ ধরতে যান না; কখনও ঘেরে কাজ করেন, কখনও ভ্যান চালান। আরাজি-সাজিয়াড়ার সোনিয়া বেগমও একইভাবে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেছেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘেরে মাছ চাষ করে সংসারের হাল ধরেছেন তিনি। সোনিয়া বলেন, "আগে আমাদের পুরুষরা নদীতে যেত, এখন আমরা নিজেরা ঘেরে কাজ করছি। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছি। মাগুরাঘোনা গ্রামের খাদিজা বেগম, বাগদা-গলদা সিবিও (কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন)-এর সহ-সভাপতি জানান, "আমাদের এলাকায় এক হাজারেরও বেশি চিংড়ি ঘের আছে। কিন্তু মৎস্য অফিসের উৎসাহে আমরা প্রথমবার ১৫ জন মহিলা ও ১০ জন পুরুষ মিলে একটি ঘের তৈরি করেছি। আধুনিক চাষ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা এবং নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছি। আশা করছি, আমরা নিজেরাই স্বাবলম্বী হতে পারব। রুদাঘরা গলদা-বাগদা সিবিও-এর সভাপতি মুক্তা বিশ্বাস বলেন, "উপজেলা মৎস্য অফিসের সহায়তায় আমাদের প্রকল্প ভালোভাবে এগিয়ে চলছে। সব লেনদেন আমরা ব্যাংকের মাধ্যমে করি। এই সমিতির মাধ্যমে এলাকার মহিলারা নতুন স্বপ্ন নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।" মুক্তা জানান, তিনি ২৫ জন সদস্যের মৎস্যচাষি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং মৎস্য অফিসের সহায়তায় ফিলিপাইন গিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগও পেয়েছেন। শোভনা বাগদা সিবিও-এর কোষাধ্যক্ষ খাদিজা বেগম বলেন, "আমরা ১৩ জন মহিলা ও ১২ জন পুরুষ মিলে শোভনা পশ্চিমপাড়ায় একটি ঘের লিজ নিয়েছি। সরকারি সহায়তায় এই প্রথম এমন প্রকল্প আমাদের এলাকায় এসেছে। অফিস থেকে হাতে-কলমে চিংড়ি চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সাইনবোর্ড, নেট, চুন, পালিশ কুড়া, ইস্ট, সার, খৈল, মাছ ও চিংড়ির পিএল এবং খাবারও পেয়েছি। তিনি আরও বলেন, "এই সহায়তা পেয়ে আমরা এখন আত্মবিশ্বাসী। আশা করছি, নিজেদের ঘাম ও পরিশ্রমে আমরা আমাদের জীবনমানের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারব। ডুমুরিয়া উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার সোহেল মো. জিল্লুর রহমান রিগান বলেন,"মৎস্য অধিদপ্তরের 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিস প্রকল্প' ও 'কমিউনিটি বেইজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় আমরা ডুমুরিয়ার প্রান্তিক নারীদের এবং জেলে সম্প্রদায়ের নারীদের প্রশিক্ষণ, ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছি যেটার লক্ষ্য–তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করা। ইতোমধ্যে বহু নারী মাছ চাষে যুক্ত হয়ে নিজেদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছেন। এই উদ্যোগ শুধু নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করছে না, বরং পরিবার ও সমাজে তাদের অবস্থানও শক্ত করছে। এক সময় যারা ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন, তারা আজ নিজের ঘেরের পাশে দাঁড়িয়ে নতুন ভবিষ্যতের গল্প লিখছেন–আত্মনির্ভরশীল এক প্রজন্মের গল্প। **(সূত্র: দৈনিক জন্মভূমি, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫)**

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫-এরমেলায় তথ্য দপ্তরের পুরস্কার গ্রহণ

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ ও মেলার আনুষ্ঠানিক সমাপনী অনুষ্ঠান ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোর মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। "জাতীয় প্রাণিসম্পদ

সপ্তাহ-২০২৫" উপলক্ষ্যে মেলার ১৫ নং স্টলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর অংশগ্রহণ করে। মেলায় এ দপ্তর কর্তৃক ১৫ ধরনের প্রায় ৬০ হাজার লিফলেট, ফোল্ডার, ব্রুসিয়ার আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া জাতীয় এ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনে সচেতনতামূলক স্ক্রল প্রচার এবং

প্রাণিসম্পদের উপর জিঙ্গেল ও ডকুমেন্টারি নির্মাণ করে অডিও ভিজুয়্যাল ভ্যানের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে রাজধানীর মহাখালি, ধানমন্ডি, গুলশান এবং কারওয়ান বাজার এলাকায় প্রচার করে তথ্য দপ্তর। পাশাপাশি "জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট ও অনুষ্ঠানের প্রচারণায় সহায়তা করে এ দপ্তর। এছাড়াও এ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসসমূহ লিফলেট, ফোল্ডার বিতরণ ও সচেতনতামূলক মাইকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. মো. মোখলেস উর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জাকারিয়া ও অ্যানিমেল হেলথ কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি সায়েম উল হক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে ১০ ক্যাটাগরিতে মোট ৩০ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। **(সূত্র : নিজস্ব প্রতিবেদক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।)**

মেসার্স এস এস বি পোল্ট্রি এন্ড হ্যাচারী কমপ্লেক্স, মোঃ ইসমাইল হোসেন টুকু, রুকিন্দীপুর, পাহাড়পুর রোড, জামালগঞ্জ, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

ডাচ ডেইরী লিমিটেড, মোঃ জিল্লুর রহমান মৃধা, সাতঘড়িয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ এ পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ

'জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫' উপলক্ষ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট খাতে বিশেষ অবদান রাখা ১৫ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রাণিসম্পদ পদক (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) প্রদান করে থাকে, যা প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী কাজে সম্পৃক্ততা বাড়াতে দেওয়া হয় এবং এই পদক প্রদান অনুষ্ঠানটি সপ্তাহের উদ্বোধনী দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রয়োজন খামার, বেগম পিংকি, আবুবক্করপুর, ৯নং ওয়ার্ড, চরফ্যাশন, ভোলা।

হীড বাংলাদেশ, সুব্রত কাম্পু, কেরামত নগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

দুধওয়ালা ফুড প্রোডাক্টস, মোঃ মোতাহের হোসেন, ২৫/এ, বিসিক শিল্প নগরী, খাদিমনগর, সিলেট।

৩ হাজার টাকায় শুরু, সাগর এখন ২০ লাখ টাকার রঙিন মাছের মালিক

রঙিন মাছের চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সরকারটারি গ্রামের বাসিন্দা সাগর সরকার। তিন হাজার টাকায় ৩৪টি রঙিন মাছ কিনেছিলেন। বাড়ির আঙিনায় মাটিতে গর্ত করে পলিথিন দিয়ে সেই মাছের চাষ শুরু করেন। ছয় বছরের ব্যবধানে তিনি গড়ে তুলেছেন মাছের খামার। নাম দিয়েছেন ‘সাগর এগ্রো ফার্ম’। সাগর সরকারের খামারে এখন ভেসে বেড়াচ্ছে নানা জাতের প্রায় দুই লাখ রঙিন মাছ। তিন হাজার টাকা দিয়ে শুরু, এখন তিনি ২০ লাখ টাকার রঙিন মাছের মালিক। খরচ বাদে মাসে আয় থাকে গড়ে ৭০ হাজার টাকা। এখন তিনি সফল উদ্যোক্তা। সফল মাছচাষি হিসেবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তিনি অর্জন করেছেন একাধিক পুরস্কার। সাগর জানালেন, রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁরা তিন বন্ধু ইউটিউবে অ্যাকোয়ারিয়ামে রঙিন মাছ চাষের পদ্ধতি দেখেন। পরে তাঁরা মিলে রঙিন মাছ চাষের পরিকল্পনা করেন। ২০১৯ সালের নভেম্বরে তিন বন্ধু মাত্র তিন হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। এই টাকায় ৩৪টি অটো ব্রিডিং এবং গোল্ড ফিশ মাছ কেনেন। নিজের বাড়ির আঙিনায় মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে পলিথিন দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে মাছের চাষ শুরু করেন। তবে শীতের কারণে তাদের বেশির ভাগ মাছ মারা যায়। দুই বন্ধু আর সাগরের সঙ্গে থাকেননি। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি টিফিন ও হাত খরচের টাকা বাঁচিয়ে প্রতি মাসে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া থেকে অক্সিজেন দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় মা মাছ আমদানি করতে থাকেন। সেই মা মাছের পোনা বড় করে বিক্রি করতেন তিনি। প্রথম দেড় বছর সাগর লাভের মুখ দেখেননি। ২০২১ সালের মাঝামাঝি থেকে তাঁর লাভ আসা শুরু হয়। আস্তে আস্তে ব্যবসা বড় হতে থাকে। মাটির গর্তের পরিবর্তে তিনি ১৮টি পাকা চৌবাচ্চায় রঙিন মাছ চাষ শুরু করেন। এখন তাঁর বাড়িতে সারি সারি চৌবাচ্চা। সেখানে আছে নানা রঙের মাছ। এর পাশাপাশি নিজের ছয়টি পুকুরেও রঙিন মাছের চাষ করছেন। পুকুরের ওপরে জাল দিয়ে ছাউনি দেন। যাতে রোদ আর ছায়া দুটোই পাওয়া যায়। বর্তমানে তাঁর খামারে নানা জাতের দুই লাখ রঙিন মাছ আছে। এগুলোর মূল্য প্রায় ২০ লাখ টাকা বলে তিনি দাবি করেন। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের সরকারটারি গ্রামের সাগর সরকারের খামারে নানা জাতের দুই লাখ রঙিন মাছ আছে। সাগরের কথা, একেকটি রঙিন মাছের দাম ১৫ টাকা থেকে ৩৫ হাজার টাকা। মাছ বিক্রির জন্য তাঁকে হাটবাজারে যেতে হয় না। খামারের নামে আছে ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল, গুগল বিজনেস। এসব ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে তিনি ঘরে বসেই সারা দেশে রঙিন মাছ বিক্রি করছেন। বিকাশ ও ব্যাংক হিসাবে টাকা নিয়ে কুরিয়ারে বিশেষ ব্যবস্থায় মাছ ক্রেতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। এভাবে শতকরা ৯০ ভাগ মাছ খুচরা ও পাইকারি দামে তিনি বিক্রি করেন। রামজীবন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বলেন, চাকরির পেছনে না ছুটে নিজের চেষ্টায় যে স্বাবলম্বী হওয়া যায়, সাগর তার দৃষ্টান্ত। তিনি নিজে এলাকার বেকার যুবকদের এভাবে মাছ চাষের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন। সাগর বাড়িতে পাকা চৌবাচ্চা করে রঙিন মাছ চাষ করছেন। মা বাবা জানান, তাঁরা সন্তানকে এই

কাজে সব সময় সাহস ও উৎসাহ দেন। জেলায় এই প্রথম রঙিন মাছ চাষ হচ্ছে জানিয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুর রাশেদ বলেন, সাগরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সাগর সরকার জানান, প্রতিবছর দেশে ৬০০ কোটি টাকার রঙিন মাছের চাহিদা আছে। দেশে উৎপাদন করা হচ্ছে এর অর্ধেক। রঙিন মাছের চাহিদাপূরণে কাজ করলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এ বিষয়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখতে চান। তাই স্বপ্ন দেখেন, খামারটি আরও অনেক বড় করার। **(সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ অক্টোবর ২০২৫)**

মিজানুর রহমানের স্বপ্নের খামার

রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলার গড়গড়ি ইউনিয়নের বাসিন্দা মিজানুর রহমান। গড়গড়ি ইউনিয়নের লোকসংখ্যা আনুমানিক ২৫ থেকে ২৬ হাজার। এখানকার মানুষ প্রধানত কৃষিজীবী। নদীর পাড়ের মানুষের মত এখানকার মানুষজন অনেক বেশি কর্মঠ। পদ্মা নদীর কারণে এখানে অনেকে মৎসজীবীও বসবাস করেন। সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা মিজানুর রহমান অনেকদিন ধরে ছোট পরিসরে গাভী পালন করতেন। নিজের ৫টি গাভী দিয়ে দুধ উৎপাদন করে নিজ এলাকায় বিক্রি করতেন, বাজারে মিষ্টির দোকানেও বিক্রি করতেন। অনেক সময় দুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় গরমের কারণে তার দুধ নষ্ট হয়ে যেত, অনেক সময় দুধের ন্যায্য দাম পাওয়া যেত না। এলাকায় বাজার সংযোগ দুর্বল ছিল। আবার গাভীর সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে দুধ উৎপাদন কম হতো। যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে তার গাভীর খামার পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হতো, ফলে আর্থিক ক্ষতি হতো। সঠিক প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে তার এই স্বল্প পরিসরের খামারটি লাভজনক হতে পারছিল না। মাসের শেষে তার খামার থেকে আয় যৎসামান্য কিন্তু ব্যয় বেশি। এতো পরিশ্রম করেও মাসের শেষে তার খামার থেকে আয় দিন দিন কমে যেতে থাকে। মিজানুরের আস্তে আস্তে এই খামার ব্যবসার প্রতি আগ্রহ কমে যেতে থাকে। এমন সময় লাইভস্টক এন্ড ডেইরি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে মিজানুর রহমান অনেকগুলি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন; যেমন : ডেইরি খামার ব্যবস্থপনা, দুধের মাণ নিয়ন্ত্রণ, রোগব্যাধি প্রতিরোধ, দুধ পক্রিয়াজাতকরণ, বাজার সংযোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়। এই প্রশিক্ষণ এর পাশাপাশি মিজানুর রহমান এর খামারে এলডিডিপি প্রকল্প থেকে একটি মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট নির্মাণে সহযোগিতা করা হয়েছে। এই মিল্ক চিলিং প্লান্ট নির্মানের ফলে দুধ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ তৈরী হয়েছে। এখন দুধ নষ্ট হওয়ার পরিমান অনেক কমে গেছে। এ ছাড়া প্রকল্প থেকে মিল্ক ক্যান, মিল্ক বাকেট, মিল্ক মেজারিং পাত্র, হ্যান্ড গ্লাভস, তাপমাত্রা ও আদ্রতা মাপার যন্ত্র, গামবুট ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। মিজানুর রহমান বলেন, "প্রকল্পের দেওয়া প্রশিক্ষণের কারণে এখন গাভীর যত্ন, খামার ব্যবস্থাপনা ও গাভীর রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণে আমি আরও বেশি দক্ষ হয়েছি, এখন কোন সমস্যা হলে বিচলিত না হয়ে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান ও উপজেলা পশু হাসপাতালের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি"। মিজানুর প্রজেক্টের সাথে জড়িত হওয়ার পর থেকে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ খামারি এবং একজন সফল দুগ্ধ উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী। বর্তমানে তার খামারের পরিধি আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। বর্তমানে তার গাভীর সংখ্যা ১৫টি, আগে ছিল ৫টি। আগে দুধ উৎপাদন হতো প্রতি গাভী থেকে ২.৮ লিটার আর এখন প্রতি গাভী থেকে উৎপাদন হয় ৬.৪ লিটার। এখন দুধ নষ্ট হওয়ার হার একদম নেই বললেই চলে। পূর্বে মাসে আয় ছিল আনুমানিক ৯০০০ টাকা এখন সে মাসে আয় করেন ১৮,৫০০ টাকা। প্রতি মাসে ১০০ লিটার দুধ প্রক্রিয়াজাত করে অতিরিক্ত আয় করে থাকেন। তিনি নিজের খামারের পাশাপাশি ৫০ জন ক্ষুদ্র খামারির কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে থাকেন। তিনি নিজেই এখন দুধ থেকে দই, ঘি, মিষ্টি ও মাঠা উৎপাদন করে নতুন বাজার সৃষ্টি করেছেন। এলাকার ছোট ছোট খামারিদের একত্র করে প্রডিউসার গ্রুপ গঠনে সহায়তা করেছেন। সেই গ্রুপের নিয়মিত মিটিং ও চাঁদা প্রদান করে গ্রুপকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। গ্রুপের মাধ্যমে দুধ সংগ্রহ ও মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য তিনি অন্যদের কে সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রডিউসার গ্রুপের অন্য সদস্যদেরকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। সবাইকে নিয়ে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। যার ফলে স্থানীয় প্রডিউসার গ্রুপ তাদের পণ্যের বাজার সংযোগ তৈরি করেছে। তার উদ্যোগে স্থানীয় কাঁচাবাজারে দুধ সরবরাহ বৃদ্ধি হয়েছে। দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে মূল্য সংযোজন হয়েছে, লাইভস্টক ডিপার্টমেন্ট এর সেবার সাথে সরাসরি কৃষকের সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মিজানুর রহমান একজন স্বপ্নের সারথী, তিনি নিজে যেমন স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন এবং স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারেন ঠিক তেমনি মিজানুর রহমান অন্যকেও স্বপ্ন দেখাতে পারেন। প্রকল্প থেকে তিনি যেমন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন আবার তিনি এলাকার ছোট ছোট খামারিদের শেখান কিভাবে দুধের মাননিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কিভাবে গাভীর যত্ন নিতে হয়, যার ফলে রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা যায়। এই খামারকে কেন্দ্র করে মিজানুরের অনেক স্বপ্ন, অনেক পরিকল্পনা। তিনি ভবিষ্যতে তার খামারে গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চান, ২৫ থেকে ৩০টি গাভীর খামার করতে চান। দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করতে চান এবং সেই সাথে নিজের একটি মিনি প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন করতে চান। তিনি বলেন, "এলডিডিপি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, আগে দুধ সংরক্ষণ ও বিক্রির সমস্যা ছিল, এখন আর সেই চিন্তা নেই। চিলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে দুধ সংরক্ষণ সহজ হয়েছে, আর প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বাড়তি আয় হচ্ছে"। এলডিডিপি প্রকল্পের মিজানুর রহমান শুধু নিজের খামার নয়, পুরো এলাকার দুধ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। **(সূত্রঃ নিজস্ব প্রতিবেদক, মৎস্য ও প্রাণিসম্প তথ্য দপ্তর)**

"খেলে মাংস, ডিম ও দুধ, সন্তান হবে রাষ্ট্রের দূত"

রাঙ্গামাটির বিএফডিসির প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকীকরণ করা হবে : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, "আমাদের লক্ষ্য হবে বিনিয়োগের মাধ্যমে কীভাবে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)-এর কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্র–বিশেষ করে ল্যান্ডিং স্টেশন আধুনিকায়ন করা যায়। এ কেন্দ্রটি উন্নত হলে শুধু রাঙ্গামাটির নয়, পুরো দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।" উপদেষ্টা ১০ কার্তিক দুপুরে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্রের মৎস্য অবতরণ ঘাট, মৎস্য ল্যান্ডিং স্টেশন, বরফ কলসহ বিএফডিসির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং-এ এসব কথা বলেন। এসময় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) ফারাহ শাম্মী, বিএফডিসি রাঙ্গামাটির ব্যবস্থাপক কমান্ডার ফয়েজ আল করিমসহ স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে মৎস্য সম্পদ বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিএফডিসির এ কেন্দ্র এখনও জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তিনি বলেন, রাঙ্গামাটির বিএফডিসি কেন্দ্রটি বহু বছর ধরে মাছ আহরণ, সংরক্ষণ ও বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখান থেকেই প্রসেস করা মাছ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু এত কার্যক্রম চললেও প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো উন্নয়নে যথাযথ নজর দেওয়া হয়নি। তাই সরকার প্রতিষ্ঠানটিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিকায়নে কাজ করে যাবে। পরে উপদেষ্টা বিকেলে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের বাংলো সংলগ্ন অভয়াশ্রম এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) অফিস সংলগ্ন অভয়াশ্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি অভয়াশ্রমের সার্বিক অবস্থা, সংরক্ষিত এলাকার মাছের প্রজনন পরিস্থিতি ও স্থানীয় জেলেদের অংশগ্রহণ বিষয়ে খোঁজখবর নেন। **(সূত্র : মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।)**

খামারি জাকির হোসেন-এর সফলতার গল্প

ঢাকা জেলার, নবাবগঞ্জ উপজেলার, চুড়াইন ইউনিয়নে জাকির হোসেন ২০২৩ সালে ১টি গবাদি পশুর খামার স্থাপন করেন। জাকির হোসেন পেশায় একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসার পাশাপাশি শুরু করেন গবাদি পশুর খামার। তিনি ২টি বকনা ও ২টি ষাঁড় গরু দিয়ে খামার শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারে ১০ টি গরু আছে। জাকির বলেন কোরবানির সময় তার খামার থেকে ২টি ষাঁড় গরু বিক্রি করেন, যা থেকে তার লাখ টাকা লাভ হয়। খাবার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তিনি বলেন, উন্নত মানের ঘাস এবং ভুট্টা ঘাস চাষ করে সাইলেজ তৈরি করেন। ঘাস খাওয়ার পাশাপাশি তিনি দানাদার খাদ্য হিসাবে গমের ভুষি, ফিড, ভুট্টার গুড়া, খৈল খাওয়ানো হয়। খামারের বাসস্থান সম্পর্কে খামারি বলেন প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয় এবং ৭ দিন পর পর পরিষ্কার পানি ও জীবানুনাশক দিয়ে ভালো ভাবে পরিষ্কার করা হয়। বর্তমানে জাকিরসহ আরও ১ জন কর্মচারী নিয়মিত গবাদি পশুকে খাবার দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ সকল কাজ করে থাকেন। খামারের বাৎসরিক ব্যয় সম্পর্কে জানতে চাইলে জাকির বলেন, ১ জন কর্মচারীর বেতন ১৩ হাজার টাকা প্রতিমাসে প্রদান করতে হয়। খাবার, মেডিসিন বাবদ ব্যয় হয় ১০ হাজার টাকা। তিনি বলেন, খামারে তার বাৎসরিক ব্যয় বাদে আয় হয় প্রায় দেড় লাখ টাকা। প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়ে জানতে চাইলে জাকির বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ৩ মাসের প্রশিক্ষণ করেছেন। তিনি আরও জানান গবাদি পশুর রোগ হলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করেন এবং তাকে প্রাণিসম্পদ অফিস

বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করেন। পরিশেষে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, ঢাকা থেকে জাকির হোসেনকে গরু পালনের সুষ্ঠু পরামর্শসহ গাভী পালন, সবুজ ঘাস সংরক্ষণ, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, গবাদি পশুর সুষম খাদ্য তৈরির উপকরণ ও খাওয়ানোর নিয়মাবলী, উন্নত জাতের ঘাস চাষ বিষয়ক লিফলেট ও ফোল্ডার প্রদান করা হয়। **(প্রতিবেদনকারী: মো.শাহরিয়ার হোসেন, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, ঢাকা)**

শামীম সিকদারের খামারে এখন ৩ শতাধিক গরু

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার বড় বাশাইল গ্রামে "রাইয়ান ডেইরি ও ফ্যাটেনিং ফার্ম" গড়ে উঠেছে একটি গবাদিপশুর খামার। এই খামারের স্বত্বাধিকারী শামীম সিকদার প্রমাণ করেছেন, সঠিক পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও পরিশ্রম থাকলে বিদেশ না গিয়েও দেশে থেকেই স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। ২০০৮ সালে জীবিকার সন্ধানে শামীম সিকদার দুবাই পাড়ি জমান। তবে পরিবার থেকে দূরে কঠোর পরিশ্রমের জীবন তাকে তৃপ্ত করতে পারেনি। তাই ২০১২ সালে দেশে ফিরে বাবার সঙ্গে যৌথভাবে মাত্র ২০টি গরু নিয়ে খামার কার্যক্রম শুরু করেন। সময়ের ব্যবধানে তার অদম্য প্রচেষ্টায় আজ সেই খামারেই রয়েছে প্রায় ৩০০টি গরু। বর্তমানে ১ একর জায়গার উপর গড়ে তোলা আধুনিক খামারের পাশাপাশি ৮ একর জমিতে তিনি নেপিয়ার, নেপিয়ার পাকচং, জার্মান ইত্যাদি জাতের ঘাস চাষ করছেন, যা খামারের খাদ্য চাহিদার বড় একটি অংশ পূরণ করছে। তিনি গবাদিপশুকে ঘাসের পাশাপাশি খৈল, ভুসি, ভুট্টার সাইলেজ ইত্যাদি সুষম খাবার প্রদান করেন। তার খামারে ফ্রিজিয়ান, শাহীওয়াল, জার্সি, মুন্ডি ও বিভিন্ন সংকর জাতের গরু পালন করা হচ্ছে। খামারের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বদা ১০ জন কর্মচারী নিয়োজিত যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। দুগ্ধ উৎপাদনেও খামারটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে ১০টি গাভী থেকে দৈনিক মোট প্রায় ২২০ লিটার দুধ পাওয়া যায় (সকালে ১৫০ লিটার এবং বিকেলে ৭০ লিটার)। পাশাপাশি ফ্যাটেনিং কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি মাসে প্রায় ৩০টি গরু বিক্রি করে গড়ে ৩.৫ লাখ টাকা লাভ করছেন। শামীম সিকদারের এই সফল উদ্যোগ বিভিন্ন মহলেও স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী মেলায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছেন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, যা তার সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, আগৈলঝাড়া নিয়মিতভাবে খামারটি তদারকি করে থাকে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. পলাশ সরকার (পিএএ) জানান, পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার কারণেই এই খামারের গরুগুলো অত্যন্ত সুস্থ রয়েছে। নিয়মিত খামার পরিদর্শন ও সময়মতো ভ্যাকসিন প্রদানের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ বিভাগ খামারটিকে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর আঞ্চলিক অফিস, বরিশালের পক্ষ হতে খামারি শামীম সিকদারকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক লিফলেট বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শামীম সিকদার তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, "টাকা খরচ করে বিদেশ না গিয়ে দেশে থেকেই গরুর খামার করলে লাভ বেশি। তবে অবশ্যই প্রশিক্ষণ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে খামার করতে হবে। তাহলেই সফলতা আসবে।" শামীম সিকদারের এই সাফল্য সাবলম্বী হওয়ার জন্য এগিয়ে যেতে এলাকার অনেক তরুণ উদ্যোক্তাকে অনুপ্রাণিত করছে। শামীম সিকদারের এই খামার শুধু একটি ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়, বরং এটি গ্রামীণ অর্থনীতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নিরাপদ প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের একটি বাস্তব উদাহরণ। সঠিক প্রশিক্ষণ, সরকারি দিকনির্দেশনা ও নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে দেশে থেকেই যে টেকসইভাবে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব শামীম সিকদারের খামার তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। **(প্রতিবেদক: জান্নাতুল ফেরদৌস, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, আঞ্চলিক অফিস, বরিশাল)**

মাছেরও রোগ হলে যাবে হাসপাতালে, খুলনায় মৎস্য হাসপাতাল উদ্বোধন

ব্যক্তি উদ্যোগে খুলনার ডুমুরিয়ার রুদাঘরা বটতলা মোড়ে মাছ চাষিদের জন্য প্রথমবারের মতো 'ফিস স্কয়ার মৎস্য হাসপাতাল' চালু হয়েছে। হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. শাহ আলম সরকার। সেবামূলক এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা আব্দুস সালাম বিশ্বাস। মানুষ যেমন অসুস্থ হলে হাসপাতালে যায়, তেমনি এখন থেকে মাছেরও রোগ হলে চিকিৎসার জন্য যাবে হাসপাতালে। মাছের রোগ বালাইসহ মাছ চাষ বিষয়ক যেকোনো সমস্যা সমাধান করতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সেবা ও পরামর্শ দেওয়া হবে এ হাসপাতালে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে শাহ্ আলম সরকার বলেন, 'মানুষের অসুখ-বিসুখে যেমন ডাক্তারের পরামর্শ ও সেবা নিতে হয়; তেমনি মাছের অসুখ সারাতে বা যেকোনো সমস্যার পরামর্শ দিতে এ ধরনের হাসপাতাল স্থাপন এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এই হাসপাতাল থেকে স্থানীয় খামারিসহ সারা বাংলাদেশের মাছ চাষিরা বিনামূল্যে পরামর্শ পেয়ে অনেক উপকৃত হবেন।' এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন খুলনা যুব উন্নয়নের সিনিয়র প্রশিক্ষক মো. সুরাত আলী, ফিস স্কয়ারের মার্কেটিং ও সেলস অফিসার মো. ইয়াসিন বিশ্বাস, হযরত সরদার, মো. শফিকুল ইসলাম গাজী প্রমুখ। **(সূত্রঃ দৈনিক দ্যা বিজনিস স্ট্যান্ডার্ড, ১৪ নভেম্বর ২০২৫)**

খামারি বোরহানের বাৎসরিক আয় ৪ লক্ষ টাকা

রাজশাহী সদর বোয়ালিয়া থানার হড়গ্রাম এলাকার বাসিন্দা বোরহান উদ্দিন। পেশায় একজন শিক্ষক হলেও এলাকার সবার কাছে তাঁর পরিচিতি খামারি হিসেবে। প্রায় ১৫ বছর আগে মাত্র দুটি গরু দিয়ে তাঁর বাড়িতে একটি খামারের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এখন সেই খামারে গাভি-ষাঁড় মিলিয়ে রয়েছে মোট ১৫ টি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বোরহান অদম্য ইচ্ছেশক্তি ও পরিশ্রমের জোরে সফল খামারি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রতিবছর তার খামার থেকে আয় হয় প্রায়

৪ লাখ টাকা। বোরহানের খামারে ১৫ টি গরুর মধ্যে বাছুরসহ গাভি রয়েছে ১২ টি। প্রতিদিন প্রায় ১৭০ লিটার দুধ উৎপাদিত হয়। খামারে দুধ ও ষাঁড়-গাভি বিক্রি করে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৪ লাখ টাকার আয় হয়। দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গরু উৎপাদনকারী এলাকা হিসেবে পরিচিত। প্রায়ই তাঁর কাছে গিয়ে খামার সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে পরামর্শ নিয়ে থাকেন উদ্যোক্তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খামারটিতে উৎপাদিত দুধের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। খামারে দুধ সংগ্রহ করা হয় সকালে ও বিকেলে। দুধ দোহানোর আগেই খামারের সামনে দুধ কেনার জন্য ভিড় করেন এলাকার বাসিন্দারা। বোরহানের নিজের বাড়ির ওই খামার থেকে প্রতিদিন প্রায় ৮০ থেকে ১০০ লিটার দুধ বিক্রি হয়। বাকিটুকু বাজারে বিক্রি করা হয়। খামারটির দুধের মান ভালো হওয়ায় বাজারেও লোকজন এই খামারের উৎপাদিত দুধের জন্য অপেক্ষায় থাকেন। বোরহান ১৯৯৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ২০১০ সালে মাত্র দুটি গরু নিয়ে খামারটির কার্যক্রম শুরু করেন তিনি। পরিকল্পিত উপায়ে খামার পরিচালনা করায় এতে বেশ সফল হোন বোরহান। তাঁর খামারে এখন ১৫ টি গরুর সঙ্গে কয়েকটি ভেড়া ও ছাগলও রয়েছে। খামারের বিষয়ে বোরহানের ছেলে বলেন, 'আমার বাবা গরু পালন খুব পছন্দ করেন। তিনি মনে করেন আধুনিক ও পরিকল্পিত উপায়ে খামার গড়া হলে সফলতা আসবেই। আমাদের খামারের উৎপাদিত দুধের প্রশংসা করেন সবাই। এটি খুব ভালো লাগে। বোরহান জানান, বর্তমানে সব খরচ বাদে শুধু গরুর খামার থেকে বছরে ৪ লাখেরও বেশি টাকা আয় হয়। গরু, খামারে ১ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। পরিশেষে, দেশি মুরগি পালন, গাভী পালন, ছাগল পালন, সবুজ ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, গবাদি পশুর সুষম খাবার তৈরীর উপকরনসহ সকল প্রকার লিফলেট, ফোল্ডার বিনামূল্যে প্রদান করা হয় এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী থেকে খামারটি পরিদর্শন করা হয়। **(প্রতিবেদনকারী : মো.খাদেমুল ইসলাম, কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী।)**

শীতকালে মাছের ফুলকা কৃমি রোগ ও ক্ষতরোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিরোধ-প্রতিকার

শীতকালে কিংবা গ্রীষ্মকালে মাছের বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গেলে এবং পানির পরিবেশ খারাপ থাকলে তা ঠিক করতে হয়। তবে তার আগে মাছের রোগ সর্ম্পকে জানতে হবে। মাছের ফুলকা কৃমি রোগের কারণ ও লক্ষণ : ড্যাকটাইলোগাইরোসিস পরজীবী সংক্রমণে এ রোগ হয়। আক্রান্ত মাছের শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যায়। দেহের বর্ণ ফ্যাকাশে হয়। ফুলকায় রক্তক্ষরণ হয়। ফুলকা পঁচে ও ফুলে যায়। মাছ দ্রুত মারা যায়। মাছ লাফালাফি করে। প্রতিরোধ ও প্রতিকার: মাছের ঘনত্ব কমাতে হবে। পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে পাথর চুন ৩ মাস পর পর দিতে হবে। জৈবসার ও সম্পূরক খাদ্য কম দিতে হবে। আক্রান্ত মাছ ২০০ পিপিএম লবণ দ্রবণে সপ্তাহে একবার হিসাবে মোট দুইবার গোসল করাতে হবে। অথবা ৫০ পিপিএম ফরমালিনে আক্রান্ত মাছকে ১ ঘণ্টা ডুবিয়ে ছেড়ে দিতে হয়। ক্ষতরোগ : বাংলাদেশে প্রায় ৩২ প্রজাতির মাছ এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত মাছের গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। Aphanomyces নামক ছত্রাক সংক্রমণে এ রোগ হয়। পরে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এরোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগে মাছের গায়ে ছোট ছোট লাল দাগ দেখা যায়। লাল দাগের স্থানে গভীর ক্ষত হয়। মাছ দ্রুত মারা যায়। চোখ নষ্ট হতে পারে। ক্ষত স্থান থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। মাছ খাদ্য গ্রহণ করে না। ক্ষতে চাপ দিলে দুর্গন্ধ ও পুঁজ বের হয়। মাছ দুর্বল হয় এবং ভারসাম্যহীনভাবে চলাফেরা করে। আক্রান্ত বেশি হলে লেজ ও পাখনা পচে খসে পড়ে। প্রতিরোধ ও প্রতিকার : শুকনো মৌসুমে পুকুরের তলা শুকাতে হবে। শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন ও ১ কেজি লবণ একত্রে প্রয়োগ করতে হবে। পোনা মজুদের আগে ২-৩% লবণ পানিতে পোনা গোসল করতে হবে। জৈবসার প্রয়োগ সীমিত করতে হবে। জাল রোদে শুকিয়ে পুকুরে ব্যবহার করতে হবে। প্রতি কেজি খাবারের সাথে ৬০-১০০ মিলিগ্রাম টেরামাইসিন বা ১ গ্রাম ক্লোরোমাইসিটিন ওষুধ মিশিয়ে পরপর ৭-১০ দিন প্রয়োগ করতে হবে। আক্রান্ত মাছকে ৫ পিপিএম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ১ ঘণ্টা অথবা ১ পিপিএম তুঁতের দ্রবণে ১০-১৫ মিনিট গোসল করাতে হয়।

(সূত্রঃ এগ্রি ২৪. টিভি, ২৭ অক্টোবর ২০২৫)

কোয়েল পাখির খামারে ভাগ্য বদলেছে জরিনার মাসে আয় লাখ টাকা

ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী মেঘালয়ের কোলঘেঁষা অজপাড়া গ্রাম জিগাতলা। ওই গ্রামের মানুষজন কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জীবন-জীবিকার তাগিদে প্রতিনিয়ত লড়াই-সংগ্রাম করে চলতে হয় এই পাহাড়ি জনপদের মানুষদের। এই গ্রামের সাহসী নারী উদ্যোক্তা জরিনা বেগম (৪০)। পাঁচ মেয়ে নিয়ে সাত সদস্যের পরিবার তার। স্বামী নাসির উদ্দিন মাদ্রাসায় বাবুর্চি হিসাবে চাকরি করতেন। স্বল্প আয় দিয়ে বছরজুড়েই থাকত অর্থনৈতিক টানাপোড়েন। এমন পরিস্থিতিতে ব্যবসা করার পরিকল্পনা করেন জরিনা। ২০০১ সালে আটশ টাকা সঞ্চয় দিয়ে কিছু কাপড় কেনেন তিনি। এরপর একটি ছাগল বিক্রি করে কেনেন সেলাই মেশিন। গ্রামের মহিলাদের কাপড় সেলাই করে নিজের সংগ্রামী জীবন শুরু করেন। ধীরে ধীরে সঞ্চয় বাড়াতে থাকেন। কাপড় বিক্রির লভ্যাংশ দিয়ে ব্যবসার পরিধি বাড়ান। হাতে-কলমে শেখানো হয় কেঁচো সার ও কোয়েল পাখি পালনের কৌশল। তিন হাজার টাকা খরচ করে কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন শুরু করেন। পরে সার বিক্রি করেন ১৭ হাজার টাকার। পাশাপাশি ইউটিউব দেখে পরিকল্পনা করেন কোয়েল পাখি পালনের। প্রথমে ৫০০ কোয়েল পাখি দিয়ে খামার শুরু করেন। খামারের লভ্যাংশ দিয়ে পাখির সংখ্যা বাড়াতে থাকেন। তিন বছরের মধ্যে জরিনা বেগমের

কোয়েল পাখির খামারে পাখির সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে ছয় হাজার। প্রতিদিন খামার থেকে অন্তত ৫ হাজার ডিম সংগ্রহ করেন তিনি। এসব ডিম তিনি স্থানীয় বাজারে এবং ঢাকায় বিক্রি করেন। এভাবে নিরক্ষর সংগ্রামী জরিনা হয়ে ওঠেন সফল উদ্যোক্তা। কোয়েল পাখির খামারে বদলেছে জরিনার জীবন। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা জয় করে আলো জ্বলেছে তার ঘরে। জরিনা বেগম এখন সমাজের পরিচিত মুখ। তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে আসেন এলাকার বেকার মানুষরা। বর্তমানে ৪৫ ফুট একটি ঘরে আটটি হাউজ থেকে ৪০ মন সারও উৎপাদন করছেন তিনি। এছাড়া তার দোকানে রয়েছে লক্ষাধিক টাকার কাপড়ও। পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস ও উদ্যোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসাবে। বর্তমানে তার ব্যবসার মূলধন রয়েছে অন্তত ১২ লাখ টাকা। যেখান থেকে তিনি প্রতিমাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করেন। তার এই সাফল্যে উদ্যোক্তা হতে উৎসাহী হচ্ছেন গ্রামীণ নারীরা। জরিনা বেগম বলেন, আমি পাঁচ কন্যাসন্তান নিয়ে খুব কষ্টে ছিলাম। আমার কোনো পড়াশোনা ছিল না। পরে একটা বয়স্ক স্কুলে পড়াশোনা করতাম। সেখানে নাম-ঠিকানাসহ কিছু জানার পর গল্প শুনি, মহিলারা ঘরে বসে আয় করে, সেলাই কাজ এবং হাঁস-মুরগি পালন করে। পরে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ শুরু করি। মোবাইলে ইউটিউবে কোয়েল পাখির ভিডিও দেখে এবং স্থানীয় উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সহযোগিতায় খামার গড়ে তুলি। জরিনা বেগম স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা করে লড়াই-সংগ্রামে সফল হয়েছেন। তাকে দেখে এখন অনেকে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উজ্জ্বল হোসেন বলেন, জরিনা বেগমের খামার সম্পর্কে অবগত হয়েছি। একজন নারী হয়ে তিনি সফল হয়েছেন। তাকে দেখে আমাদের বেকার তরুণরা উৎসাহ পেতে পারে। **(সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, ২ ডিসেম্বর ২০২৫)**

শীতকালে মাছের খাদ্য প্রয়োগ কৌশল জেনে নিন

শীত ও গ্রীষ্মকালে মাছের খাদ্য চাহিদা একরকম নয়। যার উপর মাছের উৎপাদন খরচ ও লাভ লোকসান অনেকটাই নির্ভরশীল। তাই শীতকালে মাছের খাদ্য প্রয়োগ কৌশল জানতে হবে। মার্চ থেকে অক্টোবর মাসকে মাছ উৎপাদনের অনুকূল সময় হিসাবে ধরা হয়। এ সময় মাছের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ঘটে। পানির গড় তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডি.সে. থাকায় উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছের নার্সারি খাদ্যে ৩৪ থেকে ৩৫ ভাগ প্রাণীজ ও উদ্ভিদ প্রোটিনের সমন্বয় রেখে খাদ্য তৈরি করতে হয়। অন্যদিকে গ্রোয়ার খাদ্যে রাখতে হয় ২৭ থেকে ২৮ ভাগ। শীতকালে মাছ চাষের জন্য পরিবেশ প্রতিকূল থাকে। তাপমাত্রা কমে যাওয়ার ফলে মাছের খাদ্য গ্রহণ কমে যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই চার মাস তাপমাত্রা কম থাকার ফলে মাছ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি নানা ধরনের রোগ-বালাই দেখা দেয়। শীতকালীন মাছের রোগের জন্য বাংলাদেশে বর্তমান প্রচলিত খাদ্য ব্যবস্থাও অনেকটা দায়ী, যা সাধারণত অনেকে জানেন না। শীতকালে তেলাপিয়া মাছে কিছুটা বৃদ্ধি ঘটলেও অন্যান্য সব মাছে বৃদ্ধি ঘটে না। পাঙ্গাস মাছে বরং চর্বি ভেঙ্গে ওজন ঘাটতি হয়। এমন একটি অবস্থায় শীতকালে মাছের গ্রোয়ার খাদ্যে ১৫ থেকে সর্বোচ্চ ২০ ভাগ আমিষ ও ৭ ভাগ চর্বি রেখে খাদ্য তৈরি করা উচিৎ। গবেষণা থেকে জানা যায়, মাছের খাদ্যে অন্যান্য সব উপাদান ঠিক রেখে শুধু মানসম্পন্ন ভিটামিন প্রিমিক্স ব্যবহারের ফলে ১৫ থেকে ২০ ভাগ বেশি উৎপাদন পাওয়া যায়। আবার এর সাথে খনিজ সহযোগে খাদ্য তৈরিতে উৎপাদন পাওয়া যায় ২০ থেকে ২৫ ভাগ বেশি। অর্থাৎ খাদ্য রূপান্তর হার কমে উৎপাদন খরচও অনেক কম হয়। এ ছাড়া খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ ব্যবহারে যে সুফলটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি। শীতকালে ব্যাকটেরিয়াজনিত বিভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমণ হয়। এ অবস্থা মোকাবিলা করা যায় খাদ্যে নিয়মিত প্রয়োজন অনুপাতে ভিটামিন ও খনিজ ব্যবহার করলে। মাছের খাদ্যে আমিষের পাশাপাশি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চর্বি থাকা আবশ্যক। শীতকালে মাছের ওজন কমে যাওয়ার পেছনে যে কারণটি মূলত দায়ী, তা হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ না করা বা কম গ্রহণ করার ফলে মাছের দেহে জমে থাকা চর্বি ক্ষয়। মাছের খাদ্যে চর্বির পরিমাণ ৬ থেকে ৭ ভাগ থাকা উচিৎ কিন্তু বাংলাদেশে এ ব্যপারে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয় না। দেশের মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানির খাদ্যের পরিমাণ ঠিক থাকে না। কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাদের খাদ্যের প্যাকেটের গায়ে চর্বির পরিমাণ ৩ ভাগ লিখে বাজারজাত করছে, যদিও চাহিদার তুলনায় এই পরিমাণটি কম তার পরও পরীক্ষাগারে দেখা গেছে উক্ত খাদ্যে চর্বির পরিমাণ ২ ভাগেরও নিচে আছে। সম্পূরক খাদ্যে চর্বির পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম থাকার ফলে মাছ আকর্ষণীয় রং হারায়, যার কারণে বাজারদর কিছুটা কম হয়। অনেকেই জানেন খাদ্যে আমিষের মাত্রা বাড়লে খাদ্যের দাম বাড়ে। সে ক্ষেত্রে শীতকালে মাছের আমিষের চাহিদা কম থাকা সত্ত্বেও অধিক আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগে অপচয়সহ মাছের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। অপচয়ের ধরণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুইভাবেই হতে পারে। প্রথমত, মাছ যে খাদ্য গ্রহণ করছে কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আমিষের কার্যকারিতা থাকছে না বা হজম হচ্ছে না ফলে মলের সাথে আমিষ বের হয়ে আসছে। আবার মাছ যদি খাদ্য গ্রহণ না করে সেক্ষেত্রে অপচয় হচ্ছে সরাসরি। উভয় ক্ষেত্রেই অপচয়কৃত আমিষ পঁচনের ফলে পানি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং পানিতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়। শীতকালে মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার ফলে উক্ত ব্যাকটেরিয়া নানা ধরনের রোগে মাছকে সহজেই আক্রান্ত করে। মাছ চাষে সিংহ ভাগ খরচ যেখানে মাছের খাদ্য ক্রয় বাবদ ব্যয় হয়, তাই এখানে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে যেখানে মাছ চাষ একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে সেখানে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলে মাছ চাষিরা উপকৃত হবেন। **(লেখক: মাহবুবা খানম, তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।)**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে প্রশিক্ষণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০২৫ বিষয়ক ইন-হাউস প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ৯ টায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের উপপরিচালক (উপসচিব) উম্মে হাবিবা এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ও প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য অনুবিভাগ) সৈয়দা নওয়ারা জাহান। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক পিপিআর এর বিভিন্ন রুলস, পিই, হোপ, এএ, ভেরিয়েশন, এডভারটাইজমেন্ট, বিও এবং টর ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে উম্মে হাবিবা বলেন, তথ্য দপ্তরের সকল প্রকিউরমেন্ট ইজিপির আওতায় আনতে ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে আজকের এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে

সকলকে ধারণা দিতে এ ধরনের আরও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তথ্য দপ্তরের তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ) ও তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য) সহ প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক অফিসের মোট ২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তি বিধি-বিধান সংক্রান্ত এবং বাজেট বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯

অক্টোবর ২৫) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সকাল ৯ টায় এ প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব, নীলুফা আক্তার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের উপপরিচালক (উপসচিব) উম্মে হাবিবা, প্রশিক্ষণের শুরুতেই তিনি স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান অতিথি ও প্রশিক্ষক নিলুফা আক্তার বলেন, যেকোন অফিসকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে সেই অফিসের প্রধানকে উদ্যমী, কর্মঠ ও দক্ষ হতে হবে। বর্তমানে তথ্য দপ্তরে উপপরিচালক হিসেবে যিনি আছেন তিনি অত্যন্ত উদ্যমী ও কর্মঠ। এছাড়া তিনি বলেন, তথ্য দপ্তর প্রধানের পদটি উপপরিচালক থেকে পরিচালক করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে; যাতে করে তথ্য দপ্তরে কার্যক্রম আরও গতিশীলতা পায়। এছাড়াও তিনি বলেন, যাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে, পাশাপাশি দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দুর্ভোগ কমাতে চেষ্টা করতে হবে। দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে তিনি বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, অডিট ও নিরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণের

সমাপনীতে উম্মে হাবিবা বলেন, প্রধান কার্যালয় সহ প্রত্যেকটি আঞ্চলিক অফিসকে বাজেট ও অডিট বিষয়ে স্বচ্ছ থাকতে হবে। এছাড়াও তিনি বলেন, তথ্য দপ্তরকে এগিয়ে নিতে হলে আঞ্চলিক অফিসসহ সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক অফিসসমূহ থেকে ২৩ জন কর্মকর্তা কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। **(সূত্রঃ নিজস্ব প্রতিবেদক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।)**

দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি হলেও প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন গ্রামীণ জনপদের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য; যা কালের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হয়ে অর্থনীতির মজবুত ভিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই খাত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশে প্রাণিজ আমিষের অন্যতম জোগানদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাত পুষ্টি নিরাপত্তা, মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতিগঠন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১ দশমিক ৮১ শতাংশ, জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ১৯ শতাংশ, কৃষিজ জিডিপিতে ১৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ এবং অর্থমূল্যে প্রাণিসম্পদ জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ৯১ হাজার ৩৬ কোটি টাকা (সূত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর)। ৮০'র দশকের মত এখন আর দেশের কোথাও খর্বাকায়, রুগ্ন, হাড্ডিসার গরু দেখতে পাওয়া যায় না, যা আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রাণিসম্পদের বাণিজ্যিকীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ণ, কর্মসংস্থান এবং সমৃদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রাণিসম্পদের বিস্তৃতি আজ গ্রাম থেকে শহরে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত তরুণ এবং উদ্যমী জনগোষ্ঠির স্বপ্ন জড়িয়ে আছে এই প্রাণিসম্পদে। তাদের শ্রমঘন বিনিয়োগে খুঁজে পেয়েছে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ জনপদে প্রতিটি পরিবারে পারিবারিকভাবে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন একটি প্রাচীন রীতি এবং পারিবারিক পুষ্টি ও আয়ের অন্যতম উৎস। প্রতিদিনই হাজার হাজার তরুণ যুক্ত হচ্ছে এই স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়িতে। বিবর্তনের এই ধারায় প্রথাগত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন ব্যবস্থাপনায় এসেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক বাণিজ্যিক খামার। বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা 'ফোরজি' থেকে 'ফাইভজি'তে যাচ্ছি। স্মার্টফোন এখন অনেক খামারির কাছেই আছে। পোলট্রি ও ডেইরি খামারের ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ ও সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নেয়া হচ্ছে। এছাড়া গরু কিংবা মুরগির আচরণ ক্যামেরা ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসে আমরা যেকোনো জায়গা থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারি। তাছাড়া বড় খামারিরা বায়ুপ্রবাহ, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের ব্যবহার ইন্টারনেট অব থিঙ্কস (আইওটি) প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেন্সরের মাধ্যমে ঘরে বা অফিসে বসেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর জাত উন্নয়ন এবং লাগসই সেবা সম্প্রসারণ, এআই ও আইওটি এর মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে এই খাতে। উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। বর্তমানে দেশে প্রায় ২৫১.৭১ লাখ গরু, ১৫.৩২ লাখ মহিষ, ৩৯.৮১ লাখ ভেড়া, ২৭২.৯১ লাখ ছাগল এবং ৪,০৬৬.৫২ লাখ হাঁস-মুরগী পালিত হচ্ছে (সূত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর)। তাছাড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য হারে বিভিন্ন ধরনের সৌখিন পোষা পশু-পাখি পালন বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু গবাদিপশু বা হাঁস-মুরগীর সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, পরিবর্তন এসেছে প্রাণিজ পণ্য উৎপাদনেও স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭১-'৭২ অর্থবছরে দুধ ১০ লক্ষ মেট্রিক টন, মাংস ৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১৫০ কোটি ডিমের উৎপাদন ছিল। যা বর্তমানে অসংখ্য ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড় উদ্যোক্তার বিনিয়োগ, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং প্রাণিসম্পদের বহুমাত্রিক আধুনিক সেবা সম্প্রসারণের ফলে ২০২৪-'২৫ অর্থবছরে উৎপাদিত হয়েছে ১ কোটি ৫৫ লাখ মে. টন দুধ, ৮৯ দশমিক ৫৪ লাখ মে. টন মাংস এবং ২ হাজার ৪৪০ কোটি ডিম (সূত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর), যা দেশের পুষ্টি নিরাপত্তা, প্রোটিনের চাহিদাপূরণ ও খাদ্য ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করছে। প্রাণিজ পণ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় দেশ আজ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, দুধ উৎপাদনেও এসেছে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। আশা করা যায়, অতি অল্প সময়েই দেশ দুধ উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। এছাড়া একটা সময় ছিল যখন কোরবানির পশুর চাহিদা মেটাতে পার্শ্ববর্তী দেশের অনুগ্রহের উপর তাকিয়ে থাকতে হতো; কিন্তু বর্তমানে সেই চিত্র আর নেই। বিগত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে দেশীয় উৎস হতে এই চাহিদা শতভাগ পূরণ করেও গবাদিপশু উদ্বৃত্ত থাকছে। ট্যানারি শিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) তথ্য বলছে, বছরে প্রায় ৩০ কোটি স্কয়ার ফুট চামড়ার মধ্যে ২০ কোটি স্কয়ার ফুট চামড়া রপ্তানি হচ্ছে, যার রফতানি আয় প্রায় ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) তথ্য বলছে, দেশের অভ্যন্তরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার বা সাড়ে ৩৬ হাজার কোটি টাকার। তবে চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বর্তমান সময়ের জোর দাবি। অন্যদিকে পোল্ট্রি শিল্প বর্তমানে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থানের খাত-যেখানে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি বেসরকারি বিনিয়োগ রয়েছে। দেশে নিবন্ধিত ৮৫,২২৭টি বাণিজ্যিক এবং প্রায় ১,৯১,০০০টি প্রান্তিক পোল্ট্রি খামার রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হচ্ছে- যা নিঃসন্দেহে এক বড় সাফল্য। এবার দেশে প্রথমবারের মত জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫-এর স্লোগানে দেশীয় জাতের প্রাণীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশীয় জাতের গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি বড় ভূমিকা পালন করছে। দেশি জাতের গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উন্নত জাতের গবাদিপশুর দ্বারা দেশি গাভীর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশীয় জাতের মাছ, মাংস ও প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ, যেগুলো রক্ষা করা এখন সময়ের দাবি। আশার কথা হলো, পৃথিবীর অনেক দেশের যে-সব প্রাণিসম্পদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেগুলোর অনেকগুলোই আমাদের দেশে টিকে আছে। বাড়ন্ত শিশুর দেহ গঠনের জন্য প্রাণিজ প্রোটিনের গুরুত্ব

অপরিসীম, বিশেষ করে দেহ গঠনের জন্য দুধ অত্যন্ত জরুরি। দেহ গঠনের জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সবই দুধে উপস্থিত। এ ছাড়া ডিম ও মাংস দেহ গঠনে ভূমিকা রাখে। আমাদের প্রাণিজ খাদ্যের ভোগের হার বাড়ছে। কিন্তু এটি সুষম হারে বাড়ছে কি না, সেদিকে নজর দিতে হবে। যাদের পুষ্টির প্রয়োজন, তারা প্রাণিজ আমিষ ভোগের মাধ্যমে পুষ্টি পাচ্ছে কি না, সেটি লক্ষ্য রাখতে হবে। দুধ, ডিম ও মাংসের দাম দেশের দরিদ্র জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনতে না পারলে আমরা কখনোই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব না। সুস্থ ও মেধাবী জাতি গড়ে ওঠবেনা। প্রাণিসম্পদে উপোরোল্লিখিত অর্জনসমূহকে টেকসই ও আরও সমৃদ্ধ করতে মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় "দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি : প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি" এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে দেশে প্রথমবারের মতো "জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫" ২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একযোগে সারাদেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে। দেশীয় জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার, রোগ প্রতিরোধ, প্রাণির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রদত্ত সেবা, গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে খামারি ও উদ্যোক্তাদের সচেতন করা তথা নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন ও এই খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করাই এবারের এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাত তার বিদ্যমান সকল চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ওঠবে। এতে করে সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতির সমন্বয়ে দেশ আরও এগিয়ে যাবে। **(লেখক: মো. সামছুল আলম, গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।)**

শীতকালে গবাদিপশুর যত্নে করণীয়

শীতকাল গবাদিপশুর জন্য সংবেদনশীল সময়। তাপমাত্রা কমে যাওয়ার ফলে এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। খাদ্য ও পানির চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। পাশাপাশি ঠান্ডাজনিত রোগের ঝুঁকিও বাড়ে। তাই শীত মৌসুমে গবাদিপশুর যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। শীতকালে কীভাবে যত্ন নিলে গবাদিপশু সুস্থ থাকে, উৎপাদনশীলতা বজায় থাকে এবং ঠান্ডাজনিত সমস্যা থেকে সুরক্ষিত থাকে–এসব বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

গবাদিপশুর সমস্যাসমূহ

শীতকালে গবাদিপশুর তাপমাত্রা অনেক কমে যায়, যা হাইপোথার্মিয়া নামে পরিচিত। এতে বাছুর ও অন্যান্য কম বয়সী প্রাণী নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়। এ ছাড়া কিছু ভাইরাল রোগ, যেমন-এলএসডি, এফএমডি এবং বাছুরের ভাইরাল ডায়েরিয়া রোগের প্রবণতা বেড়ে যায়। শীতে গবাদিপশুর রক্তনালী সংকুচিত হয়, পানি গ্রহণ ক্ষমতা কমে যায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে। পশুর শরীর গরম রাখার জন্য বেশি এনার্জি দরকার। এজন্য খাদ্য তালিকায় ভুষি, গম, খৈল ও গুড় রাখতে হবে। খাবার স্বাভাবিক মাত্রার থেকে ৫-১০% বৃদ্ধি করা উত্তম। পানির পরিমাণও বাড়াতে হবে। ১০° সেলসিয়াস কুসুম গরম পানি খাওয়ানো ভালো। ভিটামিন এ, ডি, ই এবং বি কমপ্লেক্স ও মিনারেল সরবরাহ করা ভালো। শীতে গোয়ালঘরে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে শীতল বাতাস না প্রবেশ করতে পারে। পর্যাপ্ত আলো প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। এ ছাড়া শীতে আরও কিছু রোগ, যেমন- লিভার ফ্লুক ও ফুট রট রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। বাছুরের বিশেষ যত্ন হচ্ছে জন্মের পর ১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের শালদুধ খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জ্যাকেট বা ভারী কাপড় দিয়ে শরীরকে রক্ষা করা যেতে পারে। নিয়মিত ভ্যাক্সিনেশন ও ডিওয়ার্মিং করাতে হবে।

দৈনিক গবাদিপশুর জন্য করণীয়

তাপমাত্রা, পালস্ রেট এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের হার পরিমাপ করতে হবে; মল-মূত্রের পরিমাণ, রং খেয়াল রাখতে হবে; দুধ উৎপাদন রেকর্ড সংরক্ষণ, চোখ, নাক ও মুখের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; রোগাক্রান্ত গবাদিপশুকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে; শীতে গর্ভবতী গাভি ও মহিষের যত্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; এ সময়ে ঠান্ডা, সংক্রমণ ও পুষ্টিহীনতার কারণে মা ও বাচ্চা–দুজনই ঝুঁকিতে থাকে।

দৈনিক স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ:

প্রতিদিন নিচের বিষয়গুলো লক্ষ্য করবেন–

ক. খাওয়ানোর প্রতি অনীহা আছে কি না।

খ. আচরণ স্বাভাবিক কি না।

গ. জ্বর, কাশি, নাক-চোখ দিয়ে পানি পড়া।

ঘ. পেট ফাঁপা, ডায়রিয়া, অতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট, খোঁড়া ভাব।

ঙ. গর্ভবতী গাভীর বাচ্চা নড়াচড়া কম মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে ভেটেরিনারি ডাক্তার দেখাতে হবে।

টিকা ও ডিওয়ার্মিং

শীতের আগেই এফএমডি, বিএসই, ব্ল্যাক কোয়ার্টার, এইচএস, পরজীবী নিয়ন্ত্রণ (ডিওয়ার্মিং) টিকা নির্দেশনা অনুযায়ী দিন।

ঠান্ডাজনিত রোগ প্রতিরোধ

শীতে সাধারণত যে রোগগুলো বাড়ে, যেমন-নিউমোনিয়া, মাস্টাইটিস, এফএমডি। প্রয়োজন হলে স্টিম ইনহেলেশন ব্যবস্থা বা শেডে আর্দ্রতা কমানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সর্বশেষ কথা হচ্ছে, কোনো উপসর্গ দেখা দিলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতালের পরামর্শ ও চিকিৎসা নিতে হবে। এতে খরচও কমবে এবং প্রাণীও সুস্থ থাকবে। কৃষক ও খামারিদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি। **(লেখক: ডা. মনিরুজ্জামান তরফদার,তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।)**

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণের নির্দেশিকা

গরু মোটাতাজাকরণ কেন করবেন?

- অল্প সময়ে গরু মোটাতাজাকরণ করে অধিক মুল্যে বাজারে বিক্রয় করা যায়
- খুবই স্বল্প সময়ে লাভসহ মূলধন ফেরত পাওয়া যায়
- অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়
- দেশের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব
- এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি কম

গরু মোটাতাজা করণের লক্ষণীয় দিক

১. উপযুক্ত সময় নির্বাচন
২. জাত নির্বাচন
৩. গরু নির্বাচন
৪. বাসস্থান
৫. কৃমি মুক্তকরণ ও বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান
৬. সুষম ও পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ
৭. নিয়মিত দৈহিক ওজন নির্ধারণ
৮. দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা
৯. বাজারে বিক্রির উপযুক্ত সময় নির্ধারণ

গরুর ফার্মে জৈব নিরাপত্তা (বায়োসিকিউরিটি) ব্যবস্থা

গরুকে রোগ জীবাণুর হাত থেকে নিরাপদে রাখাই হচ্ছে বায়োসিকিউরিটি বা জৈব নিরাপত্তার মূলকথা। যে খামারে বায়োসিকিউরিটি যত ভালো সে খামারে রোগ-ব্যাধির সমস্যা কম হবে। বায়োসিকিউরিটির ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছে:

ক. খামারে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ
খ. কর্মী ব্যবস্থাপনা
গ. সরঞ্জামাদি ব্যবস্থাপনা
ঘ. গরুর সেড ব্যবস্থাপনা
ঙ. গরু ফার্মে আনার পর ব্যবস্থাপনা

টিকা প্রদান

টিকার নাম	প্রাণীর বয়স		মাত্রা
	প্রথম ডোজ	২য় ডোজ	
ক্ষুরারোগের টিকা (ট্রাইভেলেন্ট)	কোয়ারেন্টাইনের সময় শেষে	৪ মাস পর	৬ মিলি
তড়কা রোগের টিকা	প্রথম টিকাদানের ১৪ দিন পর	১ বছর পর	১ মিলি
এল,এস,ডি রোগের টিকা	দ্বিতীয় টিকাদানের ১৪ দিন পর	১ বছর পর	১ মিলি
গলাফুলা রোগের টিকা	তৃতীয় টিকাদানের ১৪ দিন পর	১ বছর পর	২ মিলি

কৃমিনাশক সেবন

গরুর শারীরিক অবস্থার উপর ভিত্তিকরে, প্রথম টিকাদানের পর পঞ্চম দিনে কৃমিনাশন খাওয়াতে হবে। প্রয়োজন বোধে ৩ মাস পর একই নিয়মে পুনরায় খাওয়াতে হবে।

গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রতিদিন (১.২৫-১.৫) কেজি সুষম দানাদার খাদ্য, (১-১.২৫) কেজি শুকনা খড় এবং (৫-৬) কেজি কাঁচা ঘাস দিতে হবে। দানাদার খাদ্য হিসাবে মিক্স ভুষি প্রায় ১৮% প্রোটিন সমৃদ্ধ, ১.২৫ কেজি থেকে ১.৫ কেজি প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য গরুকে দেওয়া যেতে পারে।

যে কোনো পরামর্শের জন্য, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করুন

প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

আপনি জানেন কি?

বেহুন্দি জাল, কারেন্ট জাল, মশারি জাল, চরঘেরা জাল, বেড় জাল এবং ৬.৫ সেন্টিমিটারের কম ফাঁসের ইলিশ জাল ব্যবহার মৎস্য আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

নিষিদ্ধ জাল ব্যবহারে জাটকা, চিংড়ি পোনাসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের ডিম, রেণু ও পোনা বিনষ্ট হয়

ক্ষতিকর জাল ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ

প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়